হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

কার্তিক * ১৪২১

একোনপঞ্চাশৎ বর্ষ * সপ্তম সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সংঘ আচার্য্য এবং সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক

শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ

কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ

শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ

শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ

শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ

৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় * ২৬৪
শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ২৬৫
শোনাও তোমার অমৃতবাণী
কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ ২৬৭
দর্শন *
কিঙ্করী উমা ২৬৮
নিজ পূর্বজন্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর *
দেবপ্রসাদ মজুমদার ২৬৯
লীলা নিকেতনে লীলাময় *
অন্নপূর্ণা রায় ২৭২
ব্যক্তিজীবনে সদাচারের প্রয়োজনীয়তা *
সৈকত ঘোষাল ২৭৪
মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ *
হিমাংশু রায় ২৭৭
জীবনে ভোগের বাসনাকে... *
(রাজস্থানের পত্রিকাতে মহারাজের সাক্ষাৎকার) ২৮০
বন্ধন *
গৌরগোপাল বসু ২৮১
মর্তেষু অমৃতম্ *
(শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনলীলা)
মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য ২৮৩
সংঘ সমাচার
যে গান শোনাতে চাই *
কিঙ্কর সমীরণ ২৮৭
হালিশহর চৈতন্যডোবায় নগর সংকীর্তন * ২৯১
কবিতা
কবির কল্পনায়...বিজয়ার... *
কিঙ্কর বিপুলানন্দ ২৯২
শ্রীধাম *
কিঙ্করী উমা ২৯৪

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

কালচক্রের আবর্তনে শরতের পরই আসে হেমন্ত। মা দুর্গার পর তাই শক্তিরই রূপভেদে কালীর আবির্ভাব। দশমহাবিদ্যার আদ্যা বিদ্যা হলেন কালী। শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব তাঁর 'মাতৃগাথা' গ্রন্থে কালীর এরূপ নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন—''মহাসংহার সময়ে কাল সকলকে গ্রাস করে, আমি সেই কালকে গ্রাস করি বলে আমার নাম কালী।'' কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে—কাল এবং আদিভূতা বলে তিনি কালী নামে প্রসিদ্ধ।

বিশ্বজননী মহাশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের সামর্থ্য কোন জীবেরই নাই কারণ, 'অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কে বা পায়।' প্রকৃতপক্ষে তিনি বাক্য ও মনের অতীতা, সাকার হয়েও নিরাকারা। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—''আচ্ছা মা, তোর কালীমূর্ত্তি কালো কেন? কালো নয়; নীল, যেমন—আকাশ, সমুদ্র। আমার কালীবিগ্রহ অসীম-অনন্ত, তাই নীল। তোর মাথার কেশ আলুলায়িত কেন? দিক্‌সকল আমার কেশপাশ; চন্দ্র, সূর্য আমার নয়ন, আকাশ মধ্যদেশ, দ্যুলোক মস্তক, পৃথিবী চরণদ্বয়।'' এই বিরাট রূপকল্পনা তাই সাধারণ জীবের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মা তাই মায়া অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তার সন্তানদের কাছে ধরা দেন তাদেরই দুঃখ মোচনের জন্য। গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি বহুরূপের মাঝে দক্ষিণকালীই জীবের প্রতি অশেষ করুণাময়ী। তিনি যে কেবল মুক্তিকামীকেই নিজের সন্তান বলে মনে করেন তা নয়, যারা মোক্ষ চায় না, কিন্তু ধর্মপথে থাকতে চায় তাদের জন্য মা তাঁর বরমুদ্রাটি বাড়িয়ে রেখেছেন। আর অভয়মুদ্রাটি হল তাঁর মুমুক্ষু সন্তানদের জন্য। আর যারা এই জগৎ সংসারের মোহে বিজড়িত ও জর্জরিত তাদের জন্য মা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ঐ মোহরূপী অসুরকে বিনাশ করে থাকেন। এরই প্রতীকী হল মায়ের এক হাতে খড়্গ ও অপর হাতে ছিন্ন নরমুণ্ড। মায়ের এই আপাতভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ফলতঃ শুভঙ্করীই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেছেন—''ওরে অসুর সংহার করবার জন্যই ঐরূপ মূর্ত্তি ধারণ করতে হয়। তোদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যরূপ শত্রুগুলোকে, অজ্ঞানরূপ মহাশত্রুকে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে সংহার করি—আর স্নেহময়ী, প্রেমময়ী মা হয়ে কোলে করে স্তন্য পান করাই। তুই কেবল মা মা করে ডাক, তাহলে আমাকে ভয়ঙ্করী দেখ্‌বি না—অতিসুন্দর নয়ন-মন-বিমোহন আমার রূপ দেখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বি। মা মা মা সদানন্দময়ী মা—করুণাময় গুরো!''

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আবার আমরা এই মহাকালীরই কাজলবর্ণা, দশাননা রূপ দেখতে পাই। তিনি ভীমরূপা হলেও ভক্তগণকে রূপ সৌভাগ্য ও কান্তি প্রভৃতি মহাশ্রী প্রদান করেন। কোথাও আবার দেখা যায়, প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখে পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মীই মহাকালী হন। সেই তামসী মহাকালী আবার কর্মের রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধা হন। যেমন—ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মোহপ্রদা বলে 'মহামায়া', নির্ব্বাণ বা মহামৃত্যু প্রদান করেন বলে 'মহামারী', সমস্ত অবিদ্যা প্রভৃতি ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করেন বলে 'ক্ষুধা', নিখিল অবিদ্যাদি পানের ইচ্ছা রাখেন বলে 'তৃষা', যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা বলে 'নিদ্রা', সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয়া ও অনতিক্রমণীয় বীর্য্যসম্পন্না বলে 'একবীরা', কালকে নাশ করে বলে 'কালরাত্রি' প্রভৃতি নামে পরিচিতা হন। শ্রীশ্রীঠাকুর চোখের জলকেই মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার বলেছেন। কিন্তু কলির জীব আমাদের কাছে তার বড়ই অভাব। তবে ভরসা একটাই শ্রীসীতারাম বলেছেন 'হেলা শ্রদ্ধা ভাবিবার নাহি প্রয়োজন' আর 'কাতরে ডাকিলে সে শিবও আসিবে', অনাহতে তাঁর নিক্কণ নিনাদিত হবে। অযোগ্যতা নিয়েও তাই কান পেতে রই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

অষ্টম অধ্যায়, রক্তবীজবধ

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫

অন্বয় ঃ তে চ অপি রক্তসম্ভবাঃ পুরুষাঃ তত্র অতুগ্র শস্ত্রপাতাতিভীষণম্ মাতৃভিঃ সমং যুযুধুঃ ॥ ৪৫

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই শোণিতসমুৎপন্ন অসুরগণও তখন অতি উগ্র শস্ত্রপাতের দ্বারা অতি ভীষণ মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪৫

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তে চ অপি রক্তসম্ভবাঃ রক্তাজ্জাতাঃ পুরুষাঃ অসুরাঃ তত্র তদা অত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণং অতি ভীমং শস্ত্রপাতাতিভয়ঙ্করং যথা স্যাৎ তথা মাতৃভিঃ মাতৃগণৈঃ সমং সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে।

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৪৬

অন্বয় ঃ পুনশ্চ যদা বজ্রপাতেন (ঐন্দ্রী) অস্য শিরঃ ক্ষতং তদা রক্তং ববাহ ততঃ সহস্রশঃ পুরুষাঃ জাতাঃ ॥ ৪৬

বঙ্গানুবাদ ঃ পুনরায় যখন ঐন্দ্রী বজ্রপাতের দ্বারা রক্তবীজের মস্তক আহত করিলেন, তখন রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল সেই রক্ত হইতে বহু সহস্র সংখ্যক দানব উৎপন্ন হইল ॥ ৪৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ পুনঃ চ পুনরপি যদা যস্মিন্‌কালে বজ্রপাতেন কুলিশাঘাতেন (ঐন্দ্রী) ইন্দ্রশক্তিঃ অস্য রক্তবীজস্য শিরঃ মস্তকং ক্ষতং বিদারিতং তদা তস্মিন্‌কালে রক্তং শোণিতম্ ববাহ ক্ষরিতবৎ ততঃ রক্তাৎ সহস্রশঃ বহু সহস্রসংখ্যকাঃ পুরুষাঃ অসুরাঃ জাতা সমুৎপন্না।

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৪৭

অন্বয় ঃ সমরে বৈষ্ণবী চ এনং চক্রেণ অভিজঘান হ। ঐন্দ্রী তং অসুরেশ্বরং গদয়া তাড়য়ামাস ॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ ঃ যুদ্ধে বৈষ্ণবীও রক্তবীজকে চক্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। ঐন্দ্রী সেই অসুরেশ্বরকে গদার দ্বারা তাড়না করিলেন ॥ ৪৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ সমরে যুদ্ধে বৈষ্ণবী বিষ্ণুশক্তিঃ এনং রক্তবীজং চক্রেণ অভিজঘান তাড়িতবহী হ পাদপুরণে। ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ তং অসুরেশ্বরং দানবশ্রেষ্ঠং গদয়া তাড়য়ামাস যদ্বা ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরং গদয়া বাচা তাড়য়ামাস তর্জ্জিতবতী গদনং গদা ভিদাদেরাকৃতি গণত্বাদাৎ যদ্বা ঐন্দ্রীং দিশং ইতং গতম্ ঐন্দ্রীতং পূর্ব্বদিগবস্থিতম্। (তত্ত্ব প্র)।

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ॥ ৪৮

অন্বয় ঃ বৈষ্ণবী চক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ সহস্রশঃ তৎ প্রমাণৈঃ মহাসুরৈঃ জগদ্ব্যাপ্তং ॥ ৪৮

বঙ্গানুবাদ ঃ বৈষ্ণবীচক্রের দ্বারা ভিন্ন শোণিতক্ষরণজাত বহু সহস্রসংখ্যক রক্তবীজতুল্য মহাসুরের দ্বারা জগৎ পরিব্যপ্ত হইল ॥ ৪৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ বৈষ্ণবী চক্রভিন্নস্য বিষ্ণুশক্তিচক্রচ্ছিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ রক্তক্ষরণজাতৈঃ সহস্রশঃ বহুসহস্রসংখ্যকাঃ তৎপ্রমাণৈঃ তত্তল্যৈঃ মহাসুরৈঃ মহাদানবৈঃ জগৎ সংসারং ব্যাপ্তং আচ্ছন্নং।

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্॥ ৪৯

অন্বয় ঃ কৌমারী শক্ত্যা তথা বারাহী অসিনা মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন চ মহাসুরং রক্তবীজং জঘান ॥ ৪৯

বঙ্গানুবাদ ঃ কৌমারী শক্তির দ্বারা, সেইরূপ বারাহী অসির দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলের দ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আহত করিলেন॥ ৪৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কৌমারী গুহশক্তিঃ শক্ত্যা তদস্ত্রেণ তথা বারাহী অসিনা খড়্গেন মাহেশ্বরী মহেশ্বরশক্তিঃ ত্রিশূলেন চ মহাসুরং মহাদৈত্যং রক্তবীজং জঘান তাড়িতবাহী।

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৫০

অন্বয় ঃ স কোপসমাবিষ্টঃ সন্ মহাসুরঃ রক্তবীজঃ দৈত্যঃ অপি সর্ব্বাঃ এব মাতঃ পৃথক্ অহনৎ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ ঃ কোপাকুলিতচিত্ত মহাসুর রক্তবীজ দৈত্য ও সমস্ত মাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্ আঘাত করিল॥ ৫০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ স চ কোপসমাবিষ্টঃ ক্রোধাবিষ্টঃ মহাসুরঃ মহান্তঃ অসুরা যস্মাৎ রক্তবীজঃ দৈত্যঃ অসুরঃ অপি (ও) সর্ব্বাঃ সমস্তা এব মাতঃ মাতৃগণান্ পৃথক্ অহনৎ তাড়িতবান্।

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোসুরাঃ॥ ৫১

অন্বয় ঃ বহুধা শক্তিশূলাদিভিঃ আহতস্য তস্য যো বৈ রক্তৌঘঃ ভুবি পপাত তেন শতশঃ অসুরাঃ আসন্॥ ৫১

বঙ্গানুবাদ ঃ শক্তি-শূলাদির দ্বারা আহত রক্তবীজেরও যে শোণিত সমূহ পৃথিবীতে পতিত হইল, তাহাতে বহু শত সংখ্যক অসুর উৎপন্ন হইল॥ ৫১

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ শক্তিশূলাদিভিঃ আহতস্য তাড়িতস্য তস্য রক্তবীজস্য যঃ রক্তৌঘঃ রক্তসমূহঃ ভুবি ধরণ্যাং পপাত অপতৎ তেন শতশঃ বহুশতসংখ্যকাঃ অসুরাঃ দানবাঃ আসন্ জাতাঃ।

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্॥ ৫২

অন্বয় ঃ তৈঃ চ অসুরাসৃক্ সম্ভূতৈঃ অসুরৈঃ সকলং জগৎ ব্যাপ্তং আসীৎ ততঃ দেবাঃ উত্তমং ভয়ং আজগ্মুঃ॥ ৫২

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই অসুর শোণিতসম্ভূত অসুরগণের দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইল। সেই অসুরগণ হইতে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ অতিশয় ভীত হইলেন॥ ৫২

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তৈঃ চ অসুরাসৃক্ সম্ভূতৈঃ দানব-রক্তসম্ভবৈঃ অসুরৈঃ দৈতৈঃ সকলং সমস্তং জগৎ সংসারং ব্যাপ্তং আচ্ছন্নং আসীৎ বভূব ততঃ তেভ্যোহসুরেভ্যঃ দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ উত্তমং অতি মহৎ ভয়ং শঙ্কাং আজগ্মুঃ প্রাপ্তবন্তঃ।

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥ ৫৩

অন্বয় ঃ চণ্ডিকা তান্ বিষণ্ণান্ দৃষ্ট্বা সত্বরা সুরান্ প্রাহ মাভৈষ্ট কালীং উবাচ চামুণ্ডে বদনং বিস্তরং কুরু॥ ৫৩

বঙ্গানুবাদ ঃ চণ্ডিকা তাঁহাদিগকে খিন্ন দেখিয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া সুরগণকে বলিলেন—ভয় নাই, কালীকে বলিলেন—চামুণ্ডে বদন বিস্তার কর॥ ৫৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ চণ্ডিকা কৌশিকী তান্ সুরান্ বিষণ্ণান্ খিণ্ণান্ দৃষ্ট্বা বিলোক্য সত্বরা ত্বরয়া সহিতা সুরান্ দেবান্ প্রাহ উক্তবতী (মাভৈষ্ট) কালীং চামুণ্ডাং উবাচ অবোচৎ চামুণ্ডে বদনং আননং বিস্তরং বিততং কুরু।

ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ

উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ

(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

শোনাও তোমার অমৃতবাণী

কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ

'মধুর মধুর বংশীবাজে'। দৃষ্টিনন্দন হৃদয়বন্দন সেই চোরা বাঁশী বাজায় কে? তিনি জীবন বল্লভ। চুপিসারে তিনি আবির্ভূত হন হৃদয় নন্দন বলে। তিনি এখনও আমাদের উপদেশ করেন। তাঁর স্থূল শ্রীতনু পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল—এই ভারতীয় উপমহাদেশে শেষবার ৩২ বছর আগে।

সাদা টেনা পরে জটাজুট পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি তাঁর ধর্মকথা বলে চলেছেন। এ অতীব গূঢ় উপদেশ। তিনি বলেন প্রত্যেকেরই ধর্ম আছে। সেই ধর্ম তার ধর্ম। যেমন পুত্রের পিতামাতার সেবা ধর্ম, ফুলের গন্ধদান ধর্ম, জলের পানীয়ত্ব ও বহমানতা ধর্ম। সেই সেই ধর্মকে ধরে রাখাও ধর্ম। প্রত্যেকের স্বধর্ম চ্যুতিতে অধর্ম হয়। সেই অধর্মকে আবার নষ্ট করে স্ব স্ব ধর্মতে প্রতিষ্ঠার নাম ধর্মসংস্থাপন। কলিযুগে মানুষ বিবশ, অবশ হবে—স্ব চরিত্র চ্যুত হবে—তাকে আবার ধর্মপথে ফিরিয়ে আনতে হবে নিজে নাম করে ও নাম বিতরণ করে। সৎ থেকে এবং সৎ হবার চেষ্টা সমাজে করিয়ে। নিজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে।

বিশ্বের মানুষদেরও ধর্ম আছে—তাদের তাদের ধর্ম। কিন্তু বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর একাত্মতা তাদের মানবধর্মে—মানবত্বে। পশুপাখী পোকাদেরও নিজস্ব ধর্ম আছে। স্ব স্ব ধর্মে বিবৃত আছে সমগ্র বিশ্ব। একটার সঙ্গে আরেকটা এক তারে বাঁধা। আয় দ্যাখ—সারা বিশ্বে আমিই পরিব্যপ্ত আছি। তোর সামনে যে সমগ্র জীবকূল—তাতে আমি। বিশ্বে আমি। তোর মধ্যে জীবাত্মা রূপী আমি। তোর সঙ্গে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেছি—এইটে অনুভব কর। নামের আমি তোর শ্বাসে শ্বাসে। কেবল আনন্দ, পরমানন্দ।

সবে ভোর হচ্ছে। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি রেগে গেলেন। উপদেশ এ করছে আর ব্যাটা এই তালে পা ছুঁয়ে দিল? এ কেবল ব্যাটা—উপদেশে মন নেই?

চঞ্চল মন আমার ''চঞ্চল হি মনঃ কৃষ্ণ'' বরাবরই। সেইজন্যই আক্ষেপ-বিক্ষেপ। তাকে শান্ত করতেই পুনরাগমনায় চ। শারদপ্রাতের হাতছানি সুমঙ্গল করধ্বনি।

কাছে থাকলেই হয়ত বলতেন শ্রীশ্রীচণ্ডী নিয়ে বোস্। নিত্য গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করেন। কখনও হয়ত গুরুমুখী করে দেবেন।

জগজ্জননী আসছেন কখনও শ্রীশ্রীদুর্গার বেশে সপরিবারে, কখনও কালীমাতার বেশে, কখনও কন্যা লক্ষ্মীর বেশে, কখনও জগদ্ধাত্রীর বেশে। হিন্দুর এটি একটি পূজার মাস।

কখনও কন্যা, কখনও মাতা, কখনও নমসখী কখনও জায়ারূপে মাতৃশক্তি আমাদের ঘিরে আছেন—আমরা মা ছাড়া নই।

আমাদের জন্ম মা হতে—সারাজীবন ঘিরে মা—শেষকালে মৃত্যুরূপী মাতার কোলে আমরা ঢলে পড়ি।

আমার শ্রীগুরুও আমার জগন্মাতা। চিৎশক্তি, জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি—হ্লাদিনী শক্তি।

আমরা যদি হৃদয় দিয়ে গান গাই—তা মা নামেরই জয় জয়কার।

'দুর্গে, দুর্গে রক্ষণি স্বাহা—সবদিক শ্রীশ্রীদুর্গা রক্ষা করুন। এই হচ্ছে কবচের মর্ম। দুর্গা কবচ আমাদের সর্বদিক দিয়ে রক্ষা করেন। সর্বদিক দুর্গা হয়ে যান। শ্রীশ্রীদুর্গার মধ্যেই বিরাজ করি আমরা। যদি দুর্গার মধ্যেই বিরাজ করি, তাহলে আমাদের আবার ভয় কি?

যে সততই দুর্গা নাম করে—তার সর্বাভিষ্ট সিদ্ধ হয়। সর্ব কাম পরিপূরিত হয়। তিনি দুর্গা নাম জপতে

জপতে দুর্গাই হয়ে যান—অর্থাৎ দশদিকে তিনি দশ হাত বিস্তৃত করেন—কর্ম, জ্ঞান, ভাব, সাহস, কীর্তি, যশ, চরিত্র, মেধা, দয়া, করুণা তাঁর জগৎ বিস্তৃত হয়। সবাই ধন্য ধন্য করে। সে হয় মানব সমাজের বরণীয়, স্মরণীয়।

বিদ্যাসাগর চিঠির প্রথমে লিখতেন শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। নিজের মাতাকে অর্থাৎ ভগবতীদেবীকে নিত্য স্মরণ করে কাজ করতেন---তাই তার কাজ---দয়া করুণা সেবা—চতুর্দিক পাত্রাপাত্র নির্বিচারে বিস্তৃত হয়েছিল—তিনি ভারত বরেণ্য জগদ্বরেণ্য হয়েছেন—হয়েছেন মহামনীষা। মাতৃনাম শরণ করে। আবার একটি চিত্র স্মরণে আসে।

ইতিহাসে উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মত আমাদের সিদ্ধেশ্বরী কমলা মা। সীতারামের কথামতো জপযজ্ঞ করে, পতিসেবা করে মাতা জানতে পেরেছিলেন তিনিও আদি জ্যোতির কণা।

তবে পতি সীতারামের কোলেই হয় তাঁর প্রাণত্যাগ। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ ও শিবের কোলে সতীর দৃশ্যও মনে পড়ে। ভারতলননা দুর্গাশক্তিরই বিবর্তন।

ভারতলননা যদি জাগেন, তবে শুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি জেগে উঠবেন—তাঁরা উপযুক্ত ভারত সন্তান জন্ম দিয়ে এবং লালন করে দেশও জাতির গঠনের, নির্মাণের কাজ করবেন, দুর্গাশক্তিই আবর্তিত হবে মহাবীজ হতে মহামহীরূহে।

মাতৃশক্তিই গুরুশক্তি। আদি নিরঞ্জন মাতৃশক্তি—মাতৃশক্তিই আত্মপ্রবোচন শক্তি—ঐংবীজ গুরুবীজ ও কুলকুণ্ডলিনীর বীজ। আবার সরস্বতীরও বীজ।

মা মা গুরু গুরু। গুরু গুরু মা মা। জয় মা জয় মা জয় গুরু জয় গুরু। জয় মা জয় মা জয় গুরু জয় গুরু।

দর্শন

কিঙ্করী উমা

কে আমি? কি দেখা? সবই কিন্তু তাঁর। তিনি আমায় দেখান, আমি দেখি। আবার এই আমিটি-ই তাঁরই স্বরূপ। তবে কে দেখবে? কাকে দেখবো? সবই যে এক/অভিন্ন মানুষ। জীব মাত্রই তাঁর সৃষ্টি আবার তিনিই সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করার জন্য বহু হয়েছেন।

যখন কোন দেবতার মন্দিরে দেবতার দর্শন করি তার বোধ হোল, তিনি দয়াকরে তাঁর আভ্যন্তরীন রূপ দেখান তবেই আমরা দেখি। তাঁর রূপ দেখা বা তাঁতে আত্মস্থ হওয়া একই কথা। যদিও সবই তাঁর কৃপা সাপেক্ষ।

আমি দেখবো বললেও দেখা হয় না, যদি না তিনি কৃপাবরে দর্শন দেন। এই যে দেওয়া নেওয়ার আন্তরিক স্থিরতা বা অনুভব সবই তাঁরই দেওয়া অনুভব।

মানুষ তিনি ছাড়া নয়। আর আমিও তিনি ছাড়া নয়। আমার মনের মধ্যে ওঠাপড়ার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় তাই বাক্যরূন্দ্রেপ বৈখরীতে স্থান পায়। তবে যিনি বলেন বা যিনি বলান সবই যখন এক তখন আর দুইভাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, এই যে আমি, যদিও আমি বলাটা অজ্ঞানতা। এখন এই, পরমুহূর্তে কিন্তু অন্য একজন যে দেখে, যে পড়ে সবই যদি তিনি! তবে কে লেখায়, কার লেখা সবই যে তাঁর। এতে বিশেষত্ব কোথায়? কার রাগ, কার হিংসা, কার দ্বেষ, আধার আধেয় সবই যখন তিনি তবে দুরত্ব কোথায়? আর আলাদা অনুভবই কোথায়? যে দুঃখ থাকে সবই কর্ম অনুভবে তিনি কিছু দেন না, নেন না। সবই কর্মফল। যেদিন যথার্থই অনুভব হবে সেদিনই আনন্দ সেদিনই তার কৃপা পাওয়া।

নিজ পূর্বজন্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর

দেবপ্রসাদ মজুমদার

ঈশ্বরবাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ ও গুরুবাদ সনাতন ভারতবর্ষে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জন্মান্তরবাদ এদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীগীতায়, পুরাণ সমূহে, রামায়ণে, মহাভারতে জন্মান্তরের বহু কাহিনী বিদ্যমান। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীমুখে অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সকলকে বলেছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ষং বেথ পরন্তপ॥

—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সকল জানি, তুমি কিন্তু তাহা জান না। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে ও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্বজন্মের কাহিনীগুলোই তো জাতকের গল্প নামে খ্যাত, ভগবান পতঞ্জলি তাঁর পাতঞ্জল যোগ দর্শনের সাধনপাদে বলেছেন— অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে জন্মকথন্তর জ্ঞান হয়। এছাড়া তিনি বিভূতিপাদে বলেছেন---সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিচ্চানম্—সংস্কার সাক্ষাৎকার করলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। যোগীরা যোগ সাধনার দ্বারা তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে, জানতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। এমন বহু ঘটনা ও কাহিনী আছে। জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদের অন্যতম বাস্তব দৃষ্টান্ত জাতিস্মরত্ব। যে সকল মানুষ তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন তাঁদের জাতিস্মর বলা হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে তেত্রিশ হাজার জাতিস্মর আছেন বলে জানা যায়। পৃথিবীর সমস্ত অবতারপুরুষ ও যোগীশ্বরেরা জাতিস্মর ছিলেন। আধুনিককালে অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণও জাতিস্মর ছিলেন। তিনি নিজ স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং পূর্ব পূর্বজন্মে ভিন্ন ভিন্ন যুগে তিনি যে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাও তিনি নিজমুখে ভক্ত শিষ্য ও পার্ষদদের বলে গিয়েছেন—এমন বহু নজির আছে যা তাঁর জীবনীপাঠে ও পর্য্যালোচনায় জানা যায়।

জন্মান্তরবাদ নিয়ে এত কথা বলার একটা কারণ আছে। কয়েকদিন পূর্বে আলোচনাকালে বিরাগানন্দজী বললেন ঠাকুর পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। এইরূপ কথা দু-একবার পূর্বেও শুনেছিলাম, কিন্তু তখন তা মন গ্রহণ করতে পারেনি, মনে হয়েছিল ঠাকুর সীতারাম ওঙ্কারনাথদেবের ভক্ত শিষ্যরা গুরুমহিমা প্রচার করবার জন্য ঐসব কথা বলছেন। কিন্তু বিরাগানন্দজী বলবার পরে বিষয়টা অন্যরূপ গুরুত্ব পেল। ঠাকুরের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অসাধারণ। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, আচারী, তপ, জপ, ধ্যান ধারণায় নিষ্ঠাবান, আমার মত পাষণ্ডের কাছে গুরুমহিমা ব্যক্ত করে নিজেকে জাহির করবেন কেন। তাই ঠাকুর সম্বন্ধে ও ঠাকুরের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু তথ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হলাম, আশাকরি এতে আমার মত অনেকের সংশয় দূর হবে।

ডঃ শ্রী নরজাকান্ত চৌধুরী বিদ্যার্নব এম.এ.পি.এইচ.ডি.এল.এল.বি. এবং একজন রিটায়ার্ড আই.পি.এস. অফিসার। তাঁর উপাধি ও পদমর্যাদায় তিনি খ্যাত, অপরকে তোষামোদ না করলেও তাঁর চলবে, এরূপ এক বিখ্যাত জ্ঞানপুরুষ লিখছেন—''শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসাবে তিনি কিছু কিছু তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, তিনি বলছেন যে একসময় ঠাকুরের মৌনাবস্থায় তিনি ইন্দোর থেকে ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য ওঙ্কারেশ্বরে যাতায়াত করতেন। বলছেন—চটের পর্দায় চারদিক ঢাকা, ফুটার মধ্য দিয়ে তাঁরা ঠাকুরকে দর্শন করতেন। ঐ সময় কিঙ্কর গোবিন্দ দাসের কাছ থেকে জানতে পারেন

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বজন্মে কে ছিলেন, তিনি যোগবলে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন। সেইসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ ছিল যে ঐ কথা যেন তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা না হয়। এখন ঐ কথা প্রকাশ করা প্রয়োজন। কারণ যাঁরা সাক্ষাৎ ঠাকুরের মুখ থেকে পূর্বজন্মের ঐ কথা শুনেছিলেন, তাঁরা চলে গেলে ঐ কথা আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

১৯১৮ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর চুঁচুড়াতে পঞ্চমুখ মহাদেব ও জগন্মাতা পার্বতীর সাক্ষাৎ দর্শন ও কৃপালাভ করেন। এ ঘটনা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্যরা জানেন। এর অব্যবহিত পরে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দিগসুইয়ের গুরুগৃহে দরজা বন্ধ করে তিনি সরস্বতীর পূজা ও আরাধনা করছিলেন। ঐ সময় এক মূর্তি আবির্ভাব ঘটে। ঠাকুর অনুভবে জানতে পারেন যে ঐ মূর্তি তাঁর পূর্বজন্মের শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়—'মা এ জন্মেও মুক্তি দিস নি?' এ কথা ও ঘটনা অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের অজানা নয়।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ছিলেন এক অসাধারণ সাধিকা, তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশভূতা, তাঁর নানা অলৌকিক কাহিনী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই বর্তমান। ঐ আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে ঠাকুরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঠাকুর ওঙ্কারনাথ বলেছেন—'মার (আনন্দময়ী মা) সাথে পূর্বজন্মে সম্পর্ক ছিল কিনা তাই'—এই পূর্বজন্মের সম্পর্ক কি তাও ঠাকুর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও প্রকাশ করেছেন, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানেন, তাঁরা সকলেই জ্ঞান আছেন যে এক যোগেশ্বরী ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রমতে অভিষিক্ত করেন। ঐ ভৈরবী ছিলেন এক অসামান্যা রমণী, তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবতী বললেও অত্যুক্তি হয় না, ঐ ভৈরবীর সাহায্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রের কঠিন কঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ আদ্যাশক্তি তুল্যা ভগবতীই বর্তমানে এই জন্মে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা এবং যেহেতু পূর্বে পূর্বে জন্মে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল তাই ঠাকুরের এই মন্তব্য, তবে এই প্রসঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও আনন্দময়ী মায়ের সহচর্যে দীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত করেছেন। এমন শ্রীকমলেন্দু ঘোষ এই অধম লেখককে বলেছেন—ঠাকুর প্রায়শই সশিষ্য শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তখন আশ্রমে বা সাক্ষাৎকার স্থানে যেন এক দিব্যভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হত, সে দৃশ্য যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা ভাবতে বা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এছাড়া ঠাকুর ওঙ্কারনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী পূর্বজন্মে প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন।

ডঃ শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী বিদ্যাপর্ব ঠাকুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন—''শ্রীশ্রীঠাকুর (ওঙ্কারনাথ) আমাকে বলেন তিনি মৌনকালে দুইবার স্বপ্নে মা'র সান্নিধ্য পাইয়াছেন একবার তিনি তাঁর মিনু (স্তন্য) পান করিতেছিলেন। আর একবার অনুভব করেন যে মা তাঁহার পিঠে হাত রাখায় পিঠ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর জাগিয়া দেখেন পিঠের সেই স্থানটি সত্যই ভিজা, একথা শ্রীঠাকুর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন বলেন। ইহার পর আমি সাহস করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি—'বাবা, পূর্বজন্মের কথা কি আপনার মনে পড়ে?' তিনি—''জীবনী পড়িলে অনেক কিছু মনে পড়ে, তবে সবটা মনে পড়ে না। পর্দা উঠে গেল দেহ থাকবে না।'' শ্রীনীরজাকান্তবাবু আরও বলেছেন—১৯৫৮ সালের জুন মাসে দিল্লি হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাই। দেখিলাম মাল্যবতী আশ্রমের দরজার ঠিক বাহিরে মাটিতে একটি কম্বলের উপর তিনি শয়ন করিয়া আছেন, ঝিরঝির একটু হাওয়া বহিতেছে। মাত্র ৪।৫টি মায়ী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা। একজন মহিলা ঠাকুরকে বলিলেন, ''বাবা, রামকৃষ্ণ তো জাতটাত্ মানতেন না। ঠাকুর একটু রাগতভাবে জোরে বলিয়া উঠিলেন, কে বল্লে? যখন নহবৎ খানায় ছিল, সে নিজে স্বপাক হবিষ্য রান্না করে খেত। ঠাকুর এখানে 'সে' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন লক্ষণীয়। তাঁহার নিজের কথা কিনা।''

ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ড. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম.এ.ডি.লিট্ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ লিখেছেন---''শ্রীশ্রীঠাকুর যখন

গঙ্গাসাগরে যোগেন্দ্রমঠে ছিলেন, তখন একদিন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বলিলেন, ''পূর্বজন্মের জ্ঞান যখন আসে, তখন দেখিলাম যে এ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিল।''

ঠাকুরের অপর এক অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রী প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, এম.এস.সি. ভূতপূর্ব অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ, লিখছেন—১৯।১০।৫৫ তারিখে বালীগঞ্জে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সঙ্গে আলাপের পর ঠাকুর যোগেন পণ্ডিতকে বলেন—''মাকে বললাম, মা এবার মৌনে তোমার জন্মান্তরের চিত্র ভেসে উঠল। দেখলাম তুমি রামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কিত যোগেশ্বরী ভৈরবী।' পাশে আমি ছিলাম, বল্লাম—বাবা তবে আপনি কে? বাবা এ কথায় প্রায় সমাধিস্থ হওয়ার উপক্রম করলেন।

শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায়—২৫।১০।৫৫ বেলেঘাটা থেকে ঠাকুর গোপালপুর অভিমুখে ফিরছেন। গাড়ীতে ঠাকুরের দুই পাশে নীরজাকান্তবাবু ও তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বসে আছেন। তখন তারাশঙ্করবাবু বললেন—বাবা, অচিন্ত্যবাবু তো সব ফাঁস করে দিলেন—বললেন আপনিই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, এখানে অচিন্ত্যবাবু বলতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কথা বলা হয়েছে, যিনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। অচিন্ত্যবাবু বহু স্থানে লিখেছেন ও বলেছেন যে ঠাকুরই পূর্বজন্মে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় আই.এ.এস. ভূতপূর্ব রেভিনিউ সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ, ঠাকুরের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—''শ্রীশ্রীঠাকুরই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সে সম্বন্ধে সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন—সাধনার একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছালে সাধকের পূর্ব পূর্বজন্মের পরিচয় তাঁর অন্তরে আবির্ভূত হয়। তিনিও সেইভাবে পূর্ব পরিচিতি লাভ করলেন। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের ঘরের নিকট গেলেও স্বতঃই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, এমনকি দণ্ডায়মান অবস্থাতেও; তাতেও ঐ বিষয়ই প্রমাণ করে।''

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত ও শিষ্য কিঙ্কর ওঙ্কারদাস লিখছেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের একটি চিত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্থানে এক অপরিচিত সাধুর মূর্তি দেখিতে পাইতেন। একদিন তাঁহার আত্মীয় অনিল চক্রবর্তীর নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে ঐ পূর্বদৃষ্ট সাধুটি আর কেহই নহেন শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, অতঃপর তিনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।

— পথের আলোর গ্রাহকবৃন্দের প্রতি আবেদন —

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেকেই বেশ কিছু বৎসরের বাৎসরিক উপায়ন এখনও জমা দেননি। তাঁদের প্রতি বিশেষ আবেদন সত্বর বাৎসরিক উপায়ন পাঠিয়ে ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হোন। মানি অর্ডার-এ উপায়ন পাঠাবার সময় 'পথের আলো' কথাটি এবং গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করুন। প্রতিটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে দয়া করে পিনকোড নং এবং টেলিফোন নং ব্যবহার করুন।

লীলা নিকেতনে লীলাময়

অন্নপূর্ণা রায়

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

৯১ নং চৌরঙ্গী রোডের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটির একতলার কোণের এক ঘরে জমজমাটি সভার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের কাণে পৌঁছেছে খঞ্জনী বাজিয়ে নামকীর্ত্তনের মধুর সুর! অবাক হয়ে সকলেই তাকিয়েছেন রাস্তার দিকে। খোলা দরজা দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন গাড়ী থেকে নামছেন সপার্শ্বদ সীতারাম —ভগবান শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ!

চিরাচরিত প্রথামতো তাঁর ভক্তবৃন্দের কণ্ঠ থেকেই ভেসে আসছে তারকব্রহ্ম নামের সুরঝঙ্কার। তাঁদের হাতের খঞ্জনীধ্বনি চৌরঙ্গীর সাহেবি পরিমণ্ডলের শনিবারের সান্ধ্য পানভোজনের আসরের হুল্লোরে বাধা ঘটানোর স্পর্ধা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছে—কোন্ এক স্বর্গীয় আবেগে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে স্বর্গাধীশের আগমন বার্ত্তা! ক্রস্তে-ব্যস্তে ছুটে এসেছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনায় হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এসেছেন সম্মানীয় সীতারামকে।

---ঘটনাটি অনেকদিন আগেকার কিন্তু চিরস্মরণীয়। আসন গ্রহণ করে সীতারাম প্রশ্ন করলেন—''হ্যাঁ গো, তোমাদের কি আলোচনা চলছিল?'' সভাপতি সবিনয়ে আলোচনার বিষয়টি নিবেদন করলেন এবং উভয়েই ডুবে গেলেন ঐ আলোচিত তথ্যের তত্ত্বে! সীতারামের বড় প্রিয় ঐ সভাপতি নাম ''ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত'' আর উল্লিখিত সভার নাম ''শাস্ত্রধর্মপ্রচার সভা''—যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন নারায়ণ পরায়ণ পুরুষপ্রধান শ্রীশ্রীউপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। আত্মীয় সম্পর্কে নলিনীরঞ্জনের পিতৃব্য এবং আত্মিক সম্পর্কে নলিনীরঞ্জনকে 'নলিনীরঞ্জন' করার কারিগর! তা এত সব কথা তো সীতারামের জানার কথা নয়—জানার কথা নয় যে ডাক্তারবাবুর এই বিশাল বাড়ীটির নাম কেন ''লীলা নিকেতন'' আর এ বাড়ীর প্রতি ধূলিকণা কেন বৃন্দাবনের রজোগন্ধী। তবুও এ গৃহ কেন তাঁকে টানে বারবার—কিসের এ আকর্ষণ?

উত্তর জানতে হলে আরও আগের দিকে তাকাতে হবে আমাদের। ধর্মানুসরণই যাঁর জীবনের একমাত্র সম্পদ, সত্যের জয়জয়কার করাই যাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ, শাস্ত্ররক্ষাই যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই ''ডাক্তারবাবা'' শাস্ত্রপ্রাণ সীতারামের বুকের ধন। আর নলিনীরঞ্জনের কাছে সীতারাম শাস্ত্রমূর্তিমান। লীলানিকেতনে তাই বারবার হয়েছে তাঁদের উপভোগ্য মিলন—একাধিকবার বহুজন দেখেছেন সেই উপভোগ্য দৃশ্যের অপরূপতা! সীতারামকে কাছে পেয়ে আনন্দবিহ্বল নলিনীরঞ্জনের আপনভোলা আবেগ কম্পনের সামনে ''আমি যে গোলোকে এসেছি''---বলতে বলতে সীতারামের সমাধি—এ দৃশ্য বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। তবে জানতে ইচ্ছে করে কে কার বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন সেই মহামুহূর্তে? এক ভগবান কি এখানে এসে খুঁজে পেয়েছেন আর এক ভগবানকে? কে জানে? সুস্থিত হবার পর নলিনীরঞ্জনের বিনীত অনুরোধী প্রার্থনা ছিল—'পুনরাগমনায় চ'। সীতারাম বলেছেন—'আসবো না? তোমরা যে আমার শাস্ত্র রক্ষা করছো—তোমাদের কাছে এই হাত দুখানি বাঁধা।'' শাস্ত্রপ্রাণ সীতারামের জীবনে শাস্ত্রমতের গুরুত্ব অপরিসীম---আবার উপেন্দ্রমোহনও শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করাকে অক্ষমণীয় অপরাধ বলে মনে করেন। কাজেই শাস্ত্রপথে চলাই যে মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা এই শিক্ষাই জগৎবাসীকে তাঁরা দিতে চেয়েছেন। নলিনীরঞ্জনের ভক্তিপূত

শাস্ত্রনিষ্ঠায় ধরা পড়লেন সীতারাম—তাই অকপটে সর্বসমক্ষে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করলেন।

—শাস্ত্রধর্ম প্রচারসভা অত্যন্ত কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মপালন ও শাস্ত্রসম্মত পথে চলার পক্ষপাতী—এর অন্যথায় তাঁরা মারং মারং বারং বারং নীতিতে উগ্র হয়ে উঠতেও পিছপা হন না কিন্তু প্রেমের ঠাকুর সীতারাম প্রেম দিয়ে গড়া। পুরুষ কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করলে তিনি ব্যথা পান—অনুগামীরা কেউ তেমন করলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। তাই তাঁর প্রতিবাদের ভাষা ছিল ভিন্নভাবের। শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার সুউপযুক্ত চেষ্টার মধ্যেকার কড়া কথা বা রূঢ় আচরণকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি যদিও তিনি একে ভগবৎ সেবারই অঙ্গ বলে মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। এ প্রসঙ্গে নলিনীরঞ্জনকে একদিন তিনি বলেছিলেন—''ঠাকুরের শঙ্খ ও পদ্ম এর কাছে থাক আর গদা ও চক্র থাকুক তোমাদের কাছে।'' বাস্তবিক পক্ষে নানাভাবে আমরা দেখেছি যে রূঢ়তা দিয়ে নয় দৃঢ়তা দিয়ে তিনি বিপথগামীকে পথ দেখিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শাস্ত্র আমাদের শাসন করেন বাবার মতো, মায়ের মতো, গুরুর মতো—কখনও কঠোরভাবে, কখনও গভীর মমতায়, কখনও বা দৃপ্ত নির্দেশে। বন্ধন ভেবে আমরা যে অনুশাসন থেকে সরে আসতে চাইছি তা আসলে আমাদের রক্ষাকবচ। সীতারাম মানুষের বিপরীত বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য সহজভাবে সহজ ভাষায় অগণিত পুস্তক রচনা করেছেন। শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন ''আর্য্যশাস্ত্র'' প্রকাশনার ব্রতে। এই কাজের জন্য অবিরত করেছেন শাস্ত্রপাঠ যা মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দেবভাষা অনুরাগী। কেওটা গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে ব্যাণ্ডেল চার্চ স্কুলের ইংরাজী শিক্ষাতে তাঁর মন বসে নাই—ভাষার জননী সংস্কৃতের টানে তিনি যান দিগ্‌সুই গ্রামের পরমপূজ্য পণ্ডিত সাধক দাশরথি স্মৃতিভূষণের কাছে। কালক্রমে তিনিই হন সীতারামের দীক্ষাগুরু! প্রচ্ছন্নচারী পরমপুরুষ সীতারাম আপন ভগবত্তাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। লুকিয়ে রাখতে পারেন নি তাঁর জীবোদ্ধারের আকুলতা—তাই নামের মহিমা কীর্তনে তিনি যখন আত্মহারা হয়ে যেতেন, তখন অগণিত বিমুগ্ধ জন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন সেই দেবমূর্তি যাঁর—

''রূপের আলোয় ভুবন ভোলায় মাথায় বাঁধা জটা।
গলায় দোলে তুলসীমালা কপালে তিলক কাটা॥''

—আবার ঐ ভাবগদগদ ভক্তিসমাহিত কণ্ঠে যখন শাস্ত্রানুসরণের নির্দেশ দিতেন তখন সকলের কাণে ভেসে আসতো দ্বাপরের ঠাকুরটির প্রত্যয়ী ঘোষণা—

''যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারকঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥''

গীতা ১৬।২৩

(যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে—সে সিদ্ধিলাভও করে না, মোক্ষলাভও করে না এবং সুখও প্রাপ্ত হয় না)।

নিজের কল্যাণের জন্য ভগবদ্ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করাই জীবের কর্তব্য। সীতারাম দৃঢ়কণ্ঠে বারবার বলেছেন—শাস্ত্র অবিচারে মানতে হবে—তার বিচার করা ভগবদ্‌দ্রোহিতা কারণ শাস্ত্র সাক্ষাৎ নারায়ণ মুখ নিঃসৃত। শাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি শাস্ ধাতু থেকে। শাস্ ধাতুর অর্থ শাসন করা—শাস্ত্র জগৎকে শাসন করেন, কল্যাণের পথে চলার আজ্ঞা দেন। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে নিজের প্রবৃত্তি ও বিচার মেনে চলে সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রপ্রাণ সীতারাম শাস্ত্রের আবীর ছড়িয়ে মনে প্রাণে শাস্ত্র-ধর্ম প্রচার সভার মতোই বিশ্বাস করেন—

জয়ন্তি শাস্ত্রাণি দ্রবন্তি দাম্ভিকাঃ।
হৃষ্যন্তি সন্তো নিপতন্তি নাস্তিকাঃ॥

ব্যক্তিজীবনে সদাচারের প্রয়োজনীয়তা

সৈকত ঘোষাল

ব্যক্তিজীবন হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়কালটা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক নর/নারীকে অষ্টপ্রহর করে কাটাতে হয়। এই অষ্টপ্রহরের মধ্যেই ব্যক্তিজীবন আবদ্ধমান, এই সময়ে সৎ আচরণ বা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু যখনই সৎ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কথাটি বলা হবে তখন কিন্তু ২৪ ঘণ্টা থেকে ঘুমের সময়টুকু বাদ দিতে হবে, কারণ আমাদের ব্যবহারের দরকার পড়ে যতক্ষণ আমরা জাগ্রত অবস্থায় থাকি। অর্থাৎ সকালে শয্যা ত্যাগ ও নিশায় শয্যাগ্রহণ-এর মধ্যবর্তী সময়টাতেই সদাচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা তো ট্রেনে, বাসে, ট্রামে, মেট্রোতে গমনরত থাকেন। একটু সচেতন থাকলেই বুঝতে পারবেন যে—কেউ যদি আপনাকে কোমল স্বরে বলে দাদা ভালো আছেন? কোথায় যাবেন? ইত্যাদি, তখন কিন্তু আমরা তাঁর দিকে সন্দেহের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিই এবং নিজেকে ও স্ব-তলপি-তলপাগুলি সাবধানে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি, এরকম ব্যবহার আমরা কেন করি? নিজেরাই উত্তর খুঁজুন দেখবেন ঠিক এই উত্তরটাই খুঁজে পাবেন—"এরকমভাবে কেউ কি আজকাল আর বলে, যদি বলে ভাববেন ঠিক তাঁর মতলব আছে আর সেই মতলবটি 'সু' তো নয়ই বরং 'কু'।" চিন্তা করুন একবার আমরা তো কারুর সাথেই সৎ আচরণে অভ্যস্ত নই, কেউ যদি সৎ আচরণ করে, তাকেও আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। এই উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারছেন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালো ব্যবহারের অভাব রয়েছে। আমরা যদি আমাদের মনে একটি সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র অঙ্কন করি তাহলে বুঝতে পারব বা উপলব্ধি করতে পারা যাবে যে, সদাচার অক্ষত রয়েছে দরিদ্রের কাছেই, ধনীদের কাছে কিন্তু নয়, কারণ ধনীদের কাছে ধন বলে একটি অপ্রাচুর্য সম্পদ আছে। আর তার ফলেই তাঁরা দম্ভ, দর্প, আত্মাভিমানী এই সব গুণগুলির অধিকারী পুরুষ হয়, কিন্তু দরিদ্ররা এই গুণগুলি থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ তাঁদের তো আর অপ্রাচুর্য সম্পদ নেই। সৎ আচার বা ব্যবহারের প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে, আর এই যুগে অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশে তো দ্বেষের অভাব নেই অভাব আছে শুধু একটু ভালো ব্যবহারের। আর একটা দৃশ্যপট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনি কোনও ভিড় ট্রেনের কামরা তেকে আপনার গন্তব্য স্টেশনে নামবেন, ধরুণ ভালোই ভিড় আছে আর আপনি আছেন সামনের দিকে, আপনাকে যদি কোনও মনুষ্যপ্রাণী খুব নরম গলায় বলে যে, দাদা নামবেন তো? আপনি কি সেই মনুষ্যপ্রাণীটির মুখ দেখতে চেষ্টা করবেন না? অবশ্যই করবেন, কারণ আমরা তো নিজেরা ঠিকঠাক ব্যবহার করি না কিন্তু অন্যের থেকে ভালো ব্যবহারের কাঙাল। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন সদাচারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই? যেদিন আপনার সকালটা খুব ভালো কাটবে সেদিন দেখবেন আপনার সারাদিনটাই খুব ভালো কাটবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যবহারটাকেও একটু ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। ট্রেনে বাসে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সবাই খুব Gentleman সাজতে তৎপর, চশমাটি এরা উপনেত্র হিসাবে নয় বদন সৌন্দর্য্যে ব্যবহারে অভ্যস্থ, আর Shirt টি ইন্ করে টাই-টি গলায় এঁটে Suited-Booted হয়ে গৃহের বাইরে পা ফেলতে অভ্যস্ত, এঁরা আবার কোনও বৃদ্ধ মানুষকে জায়গা ছাড়ে না, কিন্তু মহিলাদের জায়গা ছাড়তে একবারও ভাবেন না, এটাই কি ভদ্রলোকের ভদ্র ব্যবহার, আর এটাই যদি সদাচার হয় তাহলে অসদাচার কোন্‌টি, জবাব দিন Go-As-You-Like এর Gentleman রা। আপনারা সমাজের দিকে একটু তাকালেই দেখতে পাবেন যে সমাজে ৩টি Category Belong করে। ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব—এদের মধ্যে মধ্যবিত্তকে আবার উচ্চ ও নিম্ন এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। একমাত্র নিম্নমধ্যবৃত্ত পরিবারগুলি কিন্তু সদাচারের বশবর্তী হয়। এদের মোটা-ভাত কাপড়ের অভাব নেই, পেটে বিদ্যেও আছে এবং এরা অপরাধমূলক কাজকর্মকে ভয় পায়, সোজা কথায় এরা খেটে খায় তাই সদাচারও এদের কাছে অটুট থাকে কিন্তু ধনীদের টাকা-পয়সার অভাব নেই তাই তাঁরা প্রশাসনকে কিনে রাখতে চায় আর গরীবরা (সবাই নয়) টাকার অভাবে কাজ না পাওয়ার

জ্বালায় সদাচার থেকে বঞ্চিত হয়। যদি প্রশ্ন করেন সদাচারাভাব যে সমাজে এখনও আছে তার প্রমাণ কি? উত্তরে বলতে হয়, প্রশ্নপ্রেরণকারী কি খবরের কাগজ বা টিভিতে খবর/সমাচার/ News দেখেন? যেখানে প্রত্যহের আবশ্যিক ঘটনা মাতৃজাতির অবমাননা? এটাকি সদাচারের পরিচয়, হ্যাঁ এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, মাতৃজাতির অবমাননার জন্য মাতৃজাতিই দায়ী। এর কারণ আপনারা উপলব্ধি করবেন কোন সম্মান বা শ্রদ্ধা জোর করে আদায় করা যায় না। এগুলি আদায় করার কোন বস্তু নয়, যদি আদায় করা হয় তা কিন্তু বেশীদিন টেকে না। এগুলি পছন্দের বিষয় আমি যাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান বা সম্ভ্রমের চোখে দেখব তাকে আমার আগে পছন্দ হতে হবে। একটা কথা আপনারা খেয়াল করবেন বাবা মা-কে আমরা একসময় পছন্দ করি বলেই তাঁদের সম্মান দিই কিন্তু যখন বাবা মা-র কাছ থেকে কিছু পাওয়ার থাকে না, তাঁদের তখন পছন্দ করি না বলেই কিন্তু সম্মানের বিষয়টাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি, আর এটা তো বাস্তব কথা যে, আমাদের বাবা মা কেন কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলছেন, না বৌমার মুখখানা দেখে যেন বৃদ্ধাশ্রমের জায়গাটা পাকা হয় তার জন্য, কিন্তু দেখবেন যে সব বাড়ির ছেলেরা সদাচারযুক্ত তাদের বাবা মায়েদের কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম দেখার ভাগ্য হয় না, বাড়ির মধ্যেই সারাটি জীবন কাটিয়ে দেন। এই আদায় করে নেওয়া সম্মান আর অধিকারী হয়ে পাওয়া সম্মানের পার্থক্যটা ঠিক গাছপাকা কলা ও কার্বাইড্ ব্যবহারে পাকা কলার মত। আর এই মাতৃজাতির সম্মানহানী নামক বস্তুটির জন্ম কিন্তু মহাভারত থেকেই। রামায়ণে কিন্তু তা আমরা দেখতে পাই না, রামায়ণে জটায়ু সীতামাকে রাক্ষসরাজ রাবণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনটা তুচ্ছ করেছিল কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে পিতামহ ভীষ্ম থাকলেও দ্রৌপদীকে তাঁর সম্মান দেবার মানসিকতা দেখান নি। এজন্যই পণ্ডিতগণ মহাভারতের থেকে রামায়ণকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাই ব্যবহার কিন্তু শিখতে হবে রামায়ণ থেকেই। আপনাকে দেখতে খুব সুন্দর, পেছন পকেটটা সবসময় উঁচু হয়ে থাকে এসব দেখে হয়ত সমাজে আপনাকে অনেকেই প্রাধান্য দেবেন কিন্তু যখন সবাই দেখবে আপনার পূর্বোল্লিখিত গুণগুলি যদি সূক্ষ্ম (সু+উচ্চ) হিমালয় পর্বতমালা হয় তাহলে আপনার ব্যবহারটি মারিয়ানা খাত তখনও কি তারা আপনার কাছে থাকবে, আপনার ব্যবহারই আপনার তো পরিচয়, Identity Card দিয়ে তো আপনার বদন চেনা যায় আপনার মানসিকতা তো চেনা যায় না, চেনা যায় ব্যবহার দিয়েই, কেউ কি জানতো আগুন এত কাজের তার ব্যবহারের পরেই তো তাকে ধীরে ধীরে চেনা যাচ্ছে। অনেকেই মাতৃজাতির অবমাননার জন্য মাতৃজাতিকেই দায়ী করেন। এখন তো নিত্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে যাচ্ছে নারীদের পোশাক-আশাক। একথা ঠিক যে নারীদের এই স্বল্পবাসই পৌরুষেন্দ্রিয়ের উত্তেজতার কারণ, প্রসঙ্গে বলে রাখি বিশ্ববরেণ্য নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী এই ছোটা ছোটা ড্রেসবালা লেড়কীদের 'নর্তকী' বলে সম্বোধন করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে এই পোশাকে সাক্ষাৎ করতে এলেও তাঁদের পোশাক ঠিক করে আসতে বলতেন। কারণ মাতৃজাতি ঠিক আচরণ না করলে পুরো পুরুষজাতিই ব্যর্থ হয়ে যায়, আমার ঘরের ভিত এলোমেলো আর আমি যদি সেই নড়বড়ে ভিত দিয়েই গগনচুম্বী বাড়ি বানাতে চাই সেটা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সামাজিক রীতি-নীতি, আদব-কায়দার ধার না ধরা রমণীদের কাছ থেকেও সু-সন্তানের আশা করাটা মীরাকেল। আপনারা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন সদাচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু আছে নয় এটা অবশ্যম্ভাবী। সকালে ঘুম থেকে উঠে দক্ষিণহস্তে টুথপেস্ট-এর সহিত টুথব্রাশ নিয়ে দাঁতের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে ভিড় ট্রেন-ট্রাম-মেট্রো-বাস থেকে নেমে বাড়িতে এসে জামা-কাপড় খসানো পর্যন্ত প্রতি পদে পদে ভালো ব্যবহারের দরকার আছে। নাহলে এখনকার প্রজন্মের ভাষায় ''ঝাড়'' খেতে হয়। এটা আপনারা ভালোই বোঝেন যে বহিঃশত্রু রামের চেয়ে ঘরশত্রু বিভীষণ অনেক বেশী ক্ষতিকারক। সেরকম আপনি আপনার ইন্দ্রিয়কে দোষ না দিয়ে, পরিবেশকে দোষ না দিয়ে আপনার ভিতরে বর্ধিতমান ছয়-শত্রুর খবর জানেন কি? জানেন না তো, আপনার মন কাম, ক্রোধ, লোভ, ইর্ষা, অসুরা, মোহ—এই ছয়রিপুর বশবর্তী হয় সর্বদা। আমার এটা চাই ওটা চাই এরকম আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করি সেটাই কাম, অল্প কারণেই রেগে গিয়ে আমার পূর্বকালীন বন্ধুর নাসিকাঘাত করলাম—এটা ক্রোধ, এই ক্রোধের বিপরীত দিক হল---সহ্য ক্ষমতা, যেটা আমাদের থলিতে একেবারেই নেই। 'সহ্য সমান গুণ নাই' একথা তো প্রবাদ বাক্য। যা আমরা মানার চেষ্টা করি না, কারণ আমরা তো এক জায়গায় স্থিত নই। এক কোম্পানীর সঙ্গে ঝামেলা হলে আর এক কোম্পানী, ওই কোম্পানীর সঙ্গে ঝামেলা হলে আর একটি কোম্পানী, 'সহ্য' নামক গুণটার অভাব আমরা বাসে বা ট্রামে

দেখতে পাই, আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন—কিভাবে করবেন? দেখবেন ট্রেনে অনেক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বাচনপটু লোক ওঠেন, সমাজের যাবতীয় খারাপ দিক নিয়ে তাদের মাথাব্যথার শেষ নেই, ওই একাই একশ মার্কা লোকটিকে লক্ষ্য করে যখন ভিড় থাকবে ঠিক তখনই ওনার পায়ে আপনার পাটি তুলে দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন ওই মনুষ্যজীবটি আপনার বংশের প্রত্যেককেই তুলছেন, এমন তোলা তুলছেন যে, হয় আপনাকে মুখে সেলো টেপ লাগাতে হবে, নয়তো স্বকর্ণে স্বাঙ্গুলি দান করতে হবে, এই তো সহ্য ক্ষমতা, না হলে কি কথায় বলে 'যে সহে সে রহে', এর পরের শত্রু লোভ। লোভটা Mother Dairy দুগ্ধের মত—অল্পেতে সাধ মেটে না। ঈর্ষা শব্দের অর্থ হিংসা, এটি আমাদের জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী, বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত একটি দোষ আমরা এমন আচরণকরি, যেন হিংসাটি আমাদের অধিকার, আমাদের হয়ত এমন বোধ হতে পারে আম্বেদকর সাহেবের ভ্রমতায় অথবা Printing mistake এর দৌলতে আমরা হিংসা নামক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হিংসার থেকেও আর বড় ''বে-গুণ" হল অসূয়া, পরের গুণে দোষাধিকার হল অসূয়া। এই গুণটি তো আমাদের পোষ্য। পাশের বাড়ির ছেলেটি খুব গরীব, কষ্ট সৃষ্ট করে পড়াশোনা করছে। একসময় সে পড়াশোনায় খারাপ ছিল কিন্তু দশম শ্রেণীতে কঠোর পরিশ্রম হেতু সে দুটো বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ফার্স্ট ডিভিশন-এ পাশ করেছে। এটা আমরা সহ্য করতে না পারায় তার পরিশ্রম নামক গুণে দোষ লেপে এরকম বলি—ও ব্যাটা টুকে লিখে পাশ করেছে। এই যে তার ফলটাকে সহ্য করতে না পেরে তাকে টুকলির জগতের সম্রাট আখ্যায় ভূষিত করলাম এটাই অসূয়া। আমরা তো প্রায়ই বলে থাকি 'আমার ভালো ওর সহ্য হয় না', আমরা কি একবারও ভেবেছি প্রতিবেশীর ভালো আমার সহ্য হয় কিনা? মোহ জিনিসটা হল একটা ঘোরে থাকার মত, সেই ঘের কেটে গেলে বুঝতে পারি কতবড় ক্ষতি আমার হয়ে গেল, যেমন এখনকার সমাজে প্রেম নামক বস্তুটি। এটা তো একপ্রকার মোহই। মেয়েটির মোহে আমি পাগল হয়ে গেলাম। যখন তার দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে মোহ কাটলো তখন দেখলাম আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। তা আর শোধ করা যায় না এবং দেখবেন যে এরকম মোহে পড়েছে তার ব্যবহারটিও কেমন যেন অসংলগ্ন হয়ে যায়। টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, গয়না প্রভৃতির মোহে পড়লেও মানুষের এই একই অবস্থা হয়। একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই বুঝতে পারবেন ষড়রিপু কিন্তু আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিমজ্জিত। এবার আপনাদের একটা গল্প বলেই আমি আমার দুর্বলচিন্তা সমন্বিত লেখার শেষ করব।

মাধবপুর নামে একটি গ্রামে একটি সাধু বটবৃক্ষের নিচে তাঁর সাধন-ভজন করত। একদা এক বৃদ্ধবয়স্কা মহিলা তাঁর নাতির হাত ধরে সাধুর কাছে এল, তারপর—

বৃদ্ধবয়স্কা—বাবা, আমার নাতি খুব মিষ্টি খায়, আপনি একটু দয়া করে বাতলে দিন, কিভাবে ওর মিষ্টি খাওয়া বন্ধ হবে?

সাধু—হুঁ! বুঝলাম।

বৃদ্ধবয়স্কা—কি বুঝলেন বাবা?

সাধু—তোর নাতির মিষ্টি খাওয়া ছাড়াতে হবে তো?

বৃদ্ধবয়স্কা—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, দয়া করুন বাবা।

সাধু—ওকে ১০দিন পর নিয়ে আসিস্।

১০ দিন পর

বৃদ্ধবয়স্কা—বাবা কাল ১০দিন হয়ে গেছে, আজ ১১দিনে পড়েছে, তাই নিয়ে এসেছি।

সাধু—আমার সামনে ওকে বসা। (এরপর সাধু তাঁর আপাদমস্তকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বুড়িমাকে একটি তাবিজ দিলেন)।

সাধু—এই তাবিজটা ওর বাহুতে পরিয়ে দিলেই ওর মিষ্টি খাওয়া ছাড়বে।

বৃদ্ধবয়স্কা—ধন্য বাবা। এবার যাই তাহলে।

সাধু—যা।

এই গল্পটা লক্ষ্য করলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, সাধু কিন্তু প্রথমেই তাকে তাবিজ দিতে পারত কিন্তু ১০দিন পর বলল কেন? এর কারণটা এরকম—সাধু নিজে খুব মিষ্টি খেত, ১০ দিনের মধ্যে নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তবে অন্যের খাওয়া ছাড়ালো। অর্থাৎ আপনার আচার ঠিক থাকলে তবেই তো অপরকে আচার ঠিক করতে বলবেন, না হলে তো আপনার দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। অতএব আপনি যদি অন্যকে সদাচার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যান তাহলে অবশ্যই নিজের আচারটি যেন সৎ হয়, সেদিকে একটু নজর দেবেন। তাহলে এ সমাজের সবাই সদাচার পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারব।

মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ

হি মা ং শু রা য়

(৩)

১২ই চৈত্র সোমবার—ডুমুরদহ হইতে মহামিলন মঠে বাসন্তী পূজা ও অন্নপূর্ণা পূজাদি দেখিয়া ২টায় ফলপ্রসাদ ও সমবেত ভক্তদের শ্রীমন্দিরে পৌঁছে দিয়ে দাঁড়ান। শ্রীশ্রী প্রণাম গ্রহণ করেন। হাজারের অধিক লোকের প্রণাম গ্রহণ এবং প্রায় ৫০জন লোককে দীক্ষাদান করেন। বেলা ৪টা অন্নভোগ নেবার অবসর হয়। এদিন রাত্রে বেদ বিদ্যালয়ে প্রসাদ নিয়ে রাতে মহামিলন মঠে আসেন ও রাত্রি ১১টায় জয়নগর যাত্রা করেন।

১৪ই চৈত্র—সদানন্দ মঠে অন্নভোগ গ্রহণান্তে মহামিলন মঠে আসেন। আসার পর রাত্রি ৯-১০টার পর বর্ধমান যাত্রা করেন।

২২শে চৈত্র শনিবার—রাত্রে মহামিলন মঠে কাশী যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে অল্প সময়ের জন্য আসেন। সহস্র সহস্র লোকের ভিড়, ঠাকুর বলেন মাত্র ১৫ মিনিট সময় হাতে আছে এর মধ্যেই বেরুতে হবে। একজন বলিলেন, 'বাবা, আপনার কর্মসূচী বিরামহীন ও দ্রুত'। ঠাকুর বলিলেন হাস্য করিতে করিতে, ঠিক স্লাইকোনের মত।' বিজয়দাদা বলিলেন, 'সাইক্লোন নয় বাবা টাইফুনের মত।' ঠাকুর হাসিতে হাসিতে শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফলপ্রসাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, তখন রাত্রি ৯টা। সহস্র সহস্র জনতা তাঁর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া 'জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউকি জয়' ধ্বনি দ্বারা আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গত ১২ই চৈত্র এক মায়ী ইষ্ট-গায়ত্রী প্রার্থনা করিলে শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন—'কত করে ইষ্টমন্ত্র জপ করিস্'?

মায়ী—একশবার। ঠাকুর—মাত্র এক মিনিট। ওরে তুই করেছিস কি? আমি যে তোকে ভগবান দিয়েছি, আর তুই মাত্র ১শত জপ করিস্।

১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার অপরাহ্নে মহামিলন মঠে আসেন। এখানে নবনির্মিত শাস্ত্র ভগবান প্রেস ভবন পদধূলিপূত করেন। সন্ধ্যা ৭টায় চলে যান উত্তর পাড়ায়। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি প্রায় ১২টায় মহামিলন মঠে আসেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সকালে অনেকে দর্শন করিতে আসেন ও অনেকের দীক্ষা হয়। একবার ঠাকুর সোদপুর যান ও চলে আসেন। ঐদিন প্রায় সহস্র লোক অন্নপ্রসাদ পান। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কলির পথ, দেহতত্ত্ব, নাম মাহাত্ম্য, উপাসনা ও 'মাং নমস্করম্'—আমাকেই সতত প্রণাম কর, নমস্কার হচ্ছে 'আত্মযজ্ঞ'—ও অন্য নদ্ধানা বিষয়ে ২ ঘণ্টারও অধিককাল ভাষণ দেন। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ মহামিলন মঠ হইতে সদানন্দ মঠে চলে যান।

৩০শে কার্তিক—শ্রীঠাকুর ঋষিকেশ চাতুর্ম্মাস্য অন্তে বাংলায় ফিরেছেন। কয়েক স্থানে কৃপা বিবরণ করে মহামিলন মঠে এলেন দুপুর ২টায়। সহস্রাধিক নরনারী প্রতীক্ষারত ছিলেন। সকাল থেকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা উপেক্ষা করে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত ছিলেন যারা, তারা ঠাকুরকে দর্শনাকাঙ্খায় আত্মহারা হয়ে এক যোগে ঠাকুরের দিকে ছুটে যান। ফলে সাময়িক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবিলম্বে ঠাকুর মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ ভক্তবৃন্দকে দর্শন দেন। দর্শনার্থীরা ফলপ্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ঠাকুর সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণান্তে শ্রীগীতা ও শ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। অতঃপর প্রার্থনা ও স্বল্পক্ষণ মৌন হয়। শেষে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করেন। রাত্রে ঠাকুরের পুণ্য সান্নিধ্যে কার্তিক পূজা হয়। ১লা অগ্রহায়ণ মহামিলন মঠে পুণ্য অবস্থান করে বহু দীক্ষার্থীকে কৃপা করে তাঁর চরণে আশ্রয় দেন। ভোরে

নামমণ্ডপ ও মন্দিরাদি পরিক্রমা করেন ঠাকুর। ঠাকুর পাইকপাড়ায় এক ভক্তগৃহে কৃপা করে পুনরায় মঠে আসিয়া মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া 'প্রার্থনা' মন্ত্র পাঠ ও শিব স্তোত্রাদি পাঠ করাইয়া সমাগত সন্তানদের স্পর্শ প্রণাম গ্রহণ করিলেন। রাত্রিকালে পাঠ ও আর ভাষণের শেষে শ্রীঠাকুরের নির্দেশে মঞ্চে নামকীর্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুরের সঙ্গে আসা সাহেবরাও হাত তুলে নৃত্য করেন। রাত্রি ৮টার পর ঠাকুর দিগসুই যাত্রা করেন। ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাসযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুর রাত্রি ১টায় মহামিলন মঠে এসে ভোগ গ্রহণ করেন। ৮ই অগ্রহায়ণ সকালে ভালভাবে দর্শন ও দূর থেকে প্রণাম করি।

১৩ই অগ্রহায়ণ—সারাদিন মহামিলন মঠে থেকে রাত্রে সদানন্দ মঠে যান ঠাকুর।

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—দুপুর ২টায় বৈদিক বিদ্যালয়ের গোপাল পণ্ডিতের বাড়ী ঠাকুর এলেন। গাড়ী থেকে নামার সময় একজন স্পর্শ প্রণাম করতে গেলে ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন। তারপর গৃহে পদধূলি দিয়ে শ্রীচরণ ধোয়ানোর পরে একটি চেয়ারে বসে হাসিমুখে সকলের প্রণাম নিলেন। ঠাকুর এখানে ভোগ নিয়ে মহামিলন মঠে চলে যান।

২৩শে পৌষ—কটক থেকে সসঙ্গী মহামিলন মঠে এসে ভোগ নেন ঠাকুর। সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতায় গমন করেন। ২৪শে পৌষ ভোরে ঠাকুরের দর্শন দান ও ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করেন। প্রাতঃকালে নির্গত হইয়া বালিটিকুরী যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফিরিয়া মহামিলন মঠ ভোগ গ্রহণ করেন। পরে রাণীগঞ্জ যান।

২৫শে পৌষ---রাত ৮টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে চিকিৎসক সংঘের অধিবেশন হয়। দূরদুরান্ত থেকে অনেক চিকিৎসক এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মহামিলন মঠে চিকিৎসা কেন্দ্রের একটি ভবন নির্মিত হইবে। ২৬শে পৌষ সকালে মহামিলন বিদ্যাপীঠের শিলান্যাস করেন ঠাকুর। ভোরে ঠাকুর ভক্তদের দর্শন দেন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। সকালে শাস্ত্র ভগবান প্রেসের ছাপার কার্যারম্ভ হয়। শ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে। দুপুরে প্রায় ৭।৮ হাজার লোকের ভীড় হয়। শ্রীঠাকুর ৪।৫ঘণ্টা প্রণাম গ্রহণ করার পরেও যেন শেষ আর হয় না। ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগের পর বহুভক্ত প্রসাদ পেয়েছেন। এইদিন প্রায় ২টায় বিদ্বৎ সংঘের পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আকর্ষণীয় এই সভায় প্রতি পক্ষে বর্তমান যুগের নানা সমস্যা ও অনেক শিক্ষণীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের পর্যালোচনা হইয়া থাকে। শ্রীঠাকুর সভায় উপস্থিতির স্বীকৃতিরূপ টিপ সহি প্রদান করেন।

সত্যধর্ম প্রচার সংঘের চতুর্দ্দশ বার্ষিক মিলন সভা

বৈকাল প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীঠাকুর উপস্থিত হন। এই সভাতেও ৫।৬ হাজার লোক উপস্থিত থাকেন। শ্রীরঘুনাথ কাব্য ব্যাকরণচার্যের ভাগবত পাঠের পর সভার কাজ শুরু হয়। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবন্যায়তীর্থ শ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা কুসুমে। তিনি বলেন—ভারতে এই প্রতিষ্ঠান যাহারা শাস্ত্র ও ধর্ম রক্ষায় ব্রতী। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর সীতারাম দাসের আশ্রয়ে আসিয়া সকলে ধন্য ধউন। শ্রীসত্যধর্ম প্রচার সংঘের মাধ্যমে ধর্ম ও শাস্ত্র রক্ষার কাজ যথেষ্ট হইতেছে। যাদবেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, নিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্থ প্রভৃতি বিদ্বৎজন এই সভাকে অলঙ্কৃত করে ভাষণ দান করেন। সর্বাধীশ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চালক পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দর্শক জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় 'জয়গুরু সম্প্রদায়ের' সকলকে সংঘ মাধ্যমে গুরুসেবা করিতে আহ্বান জানান। শ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিলেই তিনি জয়গুরু সম্প্রদায়ভুক্ত হন। সাক্ষাৎ ভাবে সকলের গুরুসেবার সৌভাগ্য নাই, তাহার সম্প্রদায়রূপ শরীরের সেবার দ্বারা গুরুসেবা করিয়া যাইতে হইবে। আরও গুরুসেবা একটি অন্য নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন। সর্বদা নাম, জপ, পূজা পাঠাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করার সামর্থ্য বা সুযোগ বা অভ্যাস নাই, সেই জন্য সহজে মুক্তির পথ গুরুসেবা যাহাতে অন্য সাধনার অপেক্ষা থাকে না, শ্রীঠাকুরের পত্রে আছে—''বাবারা অদ্যাপি সত্যধর্ম প্রচার সংঘে যোগদান কর নাই তাদের জানাচ্ছি যদি একে ভালবাস ও

আত্মকল্যাণ চাও তাহলে অবিলম্বে এ সংঘে যোগদান করত শ্রীগুরুদেবের অজস্র আশীর্বাদ লাভে কৃতার্থ হও।" রাত্রে গেলেন সদানন্দ মঠে ঠাকুর।

২৬শে মাঘ—মহামিলন মঠে কিছু সময় থেকে ঠাকুর দিগসুই যাত্রা করেন।

১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের কটকে জন্মোৎসব হয়। ৬ই ফাল্গুন রাত্রি ৩টায় কটক ত্যাগ করিয়া ৭ই ফাল্গুন, শনিবার বঙ্গভূমির উপর দিয়া বালী, বেদ বিদ্যালয় ও মহামিলন মঠ হইয়া দিগসুই গুরুধামে রাত্রি বাসান্তে পরদিবস চুঁচুড়া, কেওটা, বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল গমন করেন। ৭, ৮, ৯ই ফাল্গুন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করিয়া ১০ই ফাল্গুনের পর অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করেন। উড়িষ্যায় শ্রীঠাকুরের শরীর ক্রমশঃ খারাপ থাকার জন্যই তিনি এত তাড়াতাড়ি বাংলা ত্যাগ করেন। বাংলার সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার দর্শনের জন্য সতত উদ্‌গ্রীব। প্রত্যহ মহামিলন মঠে বহু নরনারী শ্রীঠাকুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন ও ফোন করেন। কিংকর সামানন্দ (কর্মাধ্যক্ষ, শাস্ত্রভগবান প্রেস) জানাচ্ছেন, মাঘ মাসের 'পথের আলো' ও ফাল্গুন মাসের থেকে ''দেবযান'' ও "The Mother" ছাপা হইবে। ''সংস্কৃত ভারতী'' ছাপা হচ্ছে। ''আর্য্যশাস্ত্র''ও শীঘ্রই ছাপা শুরু হবে। মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ হলেন কিঙ্কর কেশবানন্দ। 'পথের আলো'তে জানা গেল কিছুদিন পূর্বে শ্রীঠাকুর ভূপেশ পালকে প্রেসের মেশিন কিনতে বলেন।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

''প্রভু জগবন্ধু সুন্দরের'' জন্ম শতবার্ষিকী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভায় যোগদানের জন্য শ্রীঠাকুর বাংলায় এলেন। ডাক্তারের বাড়ীতে (ফনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ঠাকুর পরিহাস করে বলেন 'বড় বায়না আছে যেতে হবে'—মহাজাতি সদনে যাবার প্রাক্‌কালে। দীর্ঘ ২০ মাস পরে শ্রীঠাকুরের বাংলায় আগমন। অবশ্য এর মধ্যে ৭৭এ ফাল্গুনে তিনদিন গোপনে আসেন। ১৩৭৬এর ৩রা ফাল্গুনের পর ঋষিকেশ থেকে কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে ১৭ই কার্তিক প্রত্যুষে বর্ধমান এলেন। বাংলায় এলেন কয়েকদিনের জন্য (২ সপ্তাহের জন্য), দিগসুই, মগরা, ডুমুরদহ হয়ে মহামিলন মঠে এলেন। সত্যধর্ম প্রচার সংঘের কোষাধীশ পূজনীয় ডাঃ রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার কাছে সংবাদ পেয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মহামিলন মঠে এসে দেখলাম লোক হয়েছে শতাধিক। সকলেই প্রতীক্ষা করছেন কখন আসবেন পরমারাধ্য ঠাকুরটি। সমস্ত গুরুভাইবোনেরাই স্মৃতিচারণ করছেন শ্রীঠাকুরের পূণ্যলীলা প্রসঙ্গ। দেখলাম অনেকেই ভীড় করছেন শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দাদার কাছে শ্রীঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ শোনার জন্য। ঠাকুর এলেন রাত সাড়ে এগারোটার কিছু পরে। গাড়ী থেকে নেমে প্রথমেই শ্রীরাধাগোবিন্দ দর্শন ও প্রণাম করলেন। ওঙ্কার লেখা দণ্ড হাতে নিয়ে নামমঞ্চ প্রদক্ষিণ করলেন। তখন মাটির রাধাগোবিন্দ ও অন্য বিগ্রহ ছিল। একটি বড় মহাবীর মূর্তি ছিল। ঘরও পুরো পাকা হয়নি। তার পর ওখান থেকে গেলেন শ্রীমন্দিরে। সঙ্গে গেলেন তাঁর বহুদিনের বিরহ ব্যাকুল আদরের বাবারা মায়েরা। আর সন্ত দর্শন মানসে উপস্থিত অনুরাগীগণ। শ্রীমন্দিরে পরম গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে প্রণাম জানিয়ে ঠাকুর বাঁদিকের কোণে একটা চেয়ারে বসে সকলের প্রণাম নিতে আরম্ভ করলেন। রাসগোপাল দাদা ছিলেন ঠাকুরের পাশেই দাঁড়িয়ে। রাসদার বাহ্যিক ব্যবহারে একটু রুক্ষতা থাকলেও, পরিহাস প্রিয়তা তাঁর স্বভাবের এক মধুর দিক ছিল। জনৈক গুরুভাই ঠাকুরকে প্রণাম করছেন। রাসদা পরিহাস করে বললেন, ''বাবা, এ পার্কে একদম নাম করে না।" তাঁর সঙ্গে রাসদার পরিহাসের মধুর সম্পর্কও ছিল।

ক্রমশঃ

জীবনে ভোগের বাসনাকে পূরণ করার জন্যই ছোটাছুটি আছে, যোগ সেই দৌড়কে নিয়ন্ত্রণ করে

মানুষ আনন্দ পাওয়ার জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই আনন্দ তো বাইরে কোথাও নেই। কস্তুরী মৃগের মতো সেই আনন্দ মানুষের মধ্যেই রয়েছে। আজকের এই ব্যস্ত জীবনে আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে শান্তি এনে দিতে পারে। সকল দেবতাই এক, শুধুমাত্র আলাদা আলাদা নামের দ্বারা তাঁদের ডাকা হয়। যারা নিজের ধর্মকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না, তারাই বিবাদ করে থাকে। পত্রিকার সুধী পণ্ডিতদের বিশেষ আলোচনার মধ্যে ওঙ্কারনাথ মিশনের সংস্থাপক আচার্য বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ এই কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে এখানে কিছু কথা বলা হল—

সাংসারিক জীবনে মানুষের কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত?

সর্বদা পরমাত্মার কথা চিন্তা করতে করতে মানুষের সকল সাংসারিক কর্ম করা উচিত। বাবা-মায়ের উচিত ঈশ্বর জ্ঞান করে সন্তানের লালন-পালন করা।

আধ্যাত্মিকতাই কর্মফল ভোগের তাৎপর্য কি?

প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তার কৃত-কর্মের একটা প্রভাব পড়ে। নিষ্পাপ ব্যক্তিরা পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটার দ্বারা তাদের পূর্বজন্মের অনেক পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। পরমাত্মা ও সদ্‌গুরুর কৃপায় পাপ কর্ম থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যায়।

জীবনের দৌড়ে শান্তি কিভাবে আসে?

আজকের ব্যস্ত জীবনকে শান্তি দিতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতা। জাগতিক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা যোগেরও প্রয়োজন আছে। ভোগের বাসনা পূরণ করার জন্য মানুষকে কেবল দৌড়তেই হয়। যোগই ভোগের বাসনায় লাগাম এনে দিতে পারে। আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই জীবনের দৌড়ে শান্তি আসতে পারে।

ধর্মকে আশ্রয় করে দেশকে ভাগ করা হচ্ছে।

কৃষ্ণ, রাম, আল্লা, যীশু—এঁরা সকলেই একই আত্মা। যেমন একই ব্যক্তিকে কাকা-বাবা, মামা, ছেলে প্রভৃতি নামের দ্বারা ডাকা হয়, তেমনি ভগবানকেও বিভিন্ন নামের দ্বারা ডাকা হয়। তাই ধর্মকে আধার করে দেশকে ভাগ করা উচিত নয়।

যদি সকল ভগবান একই হন, তাহলে ভগবানকে নিয়ে এত বিবাদ কেন?

যারা নিজের ধর্মকে পুরোটা বিশ্বাস করে না, তারাই কেবল ধর্মকে নিয়ে বিবাদ করে। কিছু আবার শুধু নিজের উপকার হওয়ার আশায় ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে।

ভক্তি কি প্রকারের হয়?

ভক্তি দুই প্রকারের হয়। যেমন- সকাম ও নিষ্কাম। কামনা ও বাসনা পূরণ করার জন্য পরমাত্মার উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা করা হয়, তাই হল সকাম ভক্তি। যেখানে কেবল ভগবান লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, সেটি হল নিষ্কাম ভক্তি। কেবল সন্ন্যাসীই এই নিষ্কাম সাধনা করতে পারেন।

কিন্তু সেটি কোন্ বস্তু যা বালক থেকে বৃদ্ধ সকলেই চায়?

মানুষ আনন্দ লাভের জন্যই এত উৎকণ্ঠা করে। মৃগ কস্তুরীর সুন্দর গন্ধ প্রাপ্তির জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু সেই কস্তুরীর সুন্দর গন্ধ তো হরিণের নাভিতেই থাকে। একইভাবে মানুষও আনন্দ লাভের আশায় চারিদিকে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু এই আনন্দ তো মানুষের অন্তরেই রয়েছে।

সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ছদ্মবেশীদের দ্বারাই পূর্ণ হতে চলেছে।

সম্যক্ ন্যাস এই অর্থে সন্ন্যাস শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যাঁরা সমস্ত ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই সন্ন্যাস বলা হয়। কিছু ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদের জন্যই আজকে সমাজের বদনাম হচ্ছে। সেই ছদ্মবেশীধারী সন্ন্যাসীদের চিনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

(সিটি@সানডে পত্রিকাটি রাজস্থানের বহু প্রচারিত দৈনিক। এই পত্রিকায় গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পূজনীয় আচার্যদেব এবং সর্বাধীশ শ্রীমৎ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজীর এই সাক্ষাৎকারটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পাঠক সাধারণের অনুরোধে এই মূল্যবান নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম।)

বন্ধন

গৌ র গো পা ল ব সু

(দশম অধ্যায়)

(২)

রাখালরাজের সেবাইত গোস্বামীদের ঠিকানা হল বর্ধমান জেলার গোপালদাসপুর গ্রাম, পোস্ট বৈদ্যপুর। গোস্বামীদের পালা পর্যায়ক্রমে পড়ত। আমাদের যারা পূজা করতেন, অর্থাৎ যাদের যজমান হিসাবে আমার চিহ্নিত ছিলাম, সেই গোঁসাইদের পালাতে আমরা অন্নপ্রসাদ পেতাম। তার সঙ্গে দুতিন পদ নিরামিষ তরকারী এবং তেঁতুল পাতার টক। সব রান্নাই ঐ যমুনা নামক এক পুকুরের জল থেকে হত। এই যমুনার বিশেষ এক কাহিনী আছে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। তার পূর্বে এই রাখালরাজের মূর্তি গভীর তামালের জঙ্গলে কেমন করে এল, সেই চমকপ্রদ কাহিনীটি না শুনলে, বিগ্রহ রাখালরাজের সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। বর্তমানে আমার যতদূর স্মৃতিতে আছে, সুউচ্চ বাঁধানো চাতালের উপর এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

পাঠককূলের জ্ঞাতার্থেই রাখালরাজের কাহিনীটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে, কোন এক নিষ্ঠাবান গোস্বামী ব্রাহ্মণ পরিবার বৃন্দাবনে বাস করতেন। সেই পরিবারের যিনি কর্ত্তা ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূজারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। সবকিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তিনি নিজহাতে করতেন। স্বহস্তে কৃষ্ণকে ভোগও নিবেদন করতেন। মোটকথা ব্রাহ্মণ পরিবার বেশ সুখ এবং স্বাচ্ছন্দেই ছিলেন। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সুখ-দুঃখ চক্রবৎ ঘুরছে। তাই অকালেই এই সেবাইত পরিবারে এক ঘন অন্ধকার নেমে এল।

ব্রাহ্মণ নিত্যপূজার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্বাচিত তুলসী এবং বিশেষ ধরনের ফুল সব সময়েই প্রস্তুত করে রাখতেন। কখনও বা সদ্য ফোটা চারাগাছের ফুলটিও শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করার জন্য মনস্থ করে নিতেন।

কালের গতিতে পরদিন প্রত্যুষে দেখলেন যে তাঁর সেই চারাগাছে কোন ফুল তো নেই-ই, উল্টে গাছটিও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত এই দৃশ্য অবলোক করা মাত্রই, ব্রাহ্মণের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। তিনি এক ভীষণ অভিশাপ দিলেন, 'যে তোমার ঐ প্রিয় গাছটি থেকে ফুলটি ছিঁড়ে, গাছটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে—আগামী সাতদিনের মধ্যে যেন তার সর্পাঘাত হয়।' ব্রাহ্মণ একটু জোরেই এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন। অদূরে তাঁর স্ত্রী, এই জ্বলন্ত অভিশাপ শোনামাত্রই ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে ওঠেন। কারণ, তাঁদের একমাত্র সন্তানই ঐ গাছের ক্ষতি করেছে। এ সংবাদটি তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে জানিয়ে দিলেন। ক্ষোভে দুঃখে ব্রাহ্মণ তখন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তার মনে এমনই ক্ষোভ জন্মাল যে তিনি আর কোনমতেই ঐ বিগ্রহের পূজা করতে চাইলেন না। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা সকলেই ঐ বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন।

তাই ঐ রাত্রেই পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে ওনারা তিনজন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এবং তাঁদের সন্তান সুদূর দেশে পাড়ি দিলেন। প্রতিদিনই ব্রাহ্মণ গণনা করেন। ক্রমে ক্রমে ছয়টি দিন কাটলো। এবার সপ্তমদিন আগত! ব্রাহ্মণ নিশ্চিত যে তাঁর পুত্রের সর্পাঘাত হবেই। তাই, সেই রাত্রে তাঁরা এক গভীর বনে প্রবেশ করলে, কেবলই সর্পের দর্শন দেখতে লাগলেন। এরই পাশাপাশি আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। ব্রাহ্মণ চলার পথে সর্বদাই নুপুরের ধ্বনি এবং মাঝে মাঝে বাঁশির আওয়াজও শুনছেন। কিন্তু থেমে গেলেই ঐ মধুর ধ্বনিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণের তখন ভীষণ জেদ বেড়ে গেল। নিজেই বলে উঠলেন, এবার পিছন ফিরে দেখতেই হবে, কে আমাদের সঙ্গে আসছে এবং ঐ নুপুরের ধ্বনিই বা কোথা থেকে আসছে।

‘তখন এক দৈববাণী হল। সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে। ‘আমি তোর ইষ্টদেবতা। আজ কয়দিন আমি অভুক্ত। যেহেতু তুই আমাকে পরিত্যাগ করেছিস, তাই আমি তোর সঙ্গ ছাড়িনি।” ব্রাহ্মণ সেই দৈববাণীর প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘‘প্রভু, যদি আমার উপর তোমার এতই কৃপা, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে দরশন দাও। পুনরায় দৈববাণী ‘‘তথাস্তু” কিন্তু একটা শর্তে। আমার দরশন লাভের পরই যে মূর্তিতে আমি প্রতিষ্ঠিত হতে চাই, এই গভীর বনের মধ্যে, সেই মূর্তিতেই তুই নিত্য পূজা, ভোগ ইত্যাদি প্রদান করবি। তোর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তাই তোর পুত্রের অভিশাপ আমি খণ্ডন করে দিলাম।” এর কিয়ৎক্ষণ পরেই হঠাৎ এক জ্যোতি সেই গভীর বনের মধ্যে ফুটে, সমগ্র বনটিকে আলোকিত করে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিহাতে এবং পায়ে নূপুরসহ সেই ব্রাহ্মণকে দরশন দিলেন।

পরমুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে এবং পাঁচনসহ একজন বারো বছরের বালকরূপ ধরে, ব্রাহ্মণকে দরশনদান করেই আদেশ করলেন, ‘‘আমি এই রূপেই পূজিত হতে চাই, আমার প্রচারের ব্যবস্থা করবি।” ব্রাহ্মণ হতবাক হয়ে একেবারেই সেই রাখালরাজ মূর্তির পাদদেশে কেবলই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সাথী কেবল ছিলেন স্ত্রী এবং সদ্য অভিশাপ থেকে মুক্ত পুত্র। এইভাবেই ঐ গভীর রাত্রি কখন যে কেটে গেছে, তাঁদের খেয়ালই নেই। পরদিন বেশ সকালে যখন প্রচুর লোকেদের হঠাৎ কোলাহল, তাঁদের কর্ণগুহরে পৌঁছিল, তখনই ব্রাহ্মণের সেই মোহ আবেশ কাটলো। সম্মুখেই দাঁড়িয়ে সেই এলাকার জমিদারবাবু এবং তাঁর সঙ্গে প্রচুর লোকজন। জমিদারবাবুর নির্দেশে বিশেষ সীমানা ছাড়া, সর্বত্রই বন কাটা হল। পাশের সেই ডোবা যমুনাকেও পরিষ্কার করা হল। মাটি থেকে নতুন করে জল উঠে পুকুরটি কানায় কানায় পূর্ণ হল।

পরে জমিদারবাবু যে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তিনি বর্ণনা করলেন। সেই দিনেই তিনি ঐ গোস্বামী বাবাজীকে তিনশত বিঘা নিষ্কর জমি দানপত্র করে দিলেন। জমিদারবাবু এও ব্যবস্থা করলেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারের ভরণপোষণ থেকে আরম্ভ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা, নাটমন্দির তৈরী করা এবং ঐ মন্দির সংলগ্ন বিরাট তুলসী বনের পূর্ণ সংস্কার এবং সর্বোপরি আরও লোকজনের বসতির পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেওয়া। তার মৌজার অন্তর্গত এই তিনশ বিঘা জমিসহ সমগ্র এলাকাটির নামকরণ হল গোপালদাসপুর। বৈঁচী স্টেশনে নেমে বৈদ্যপুরে আসতে হয়। এখান থেকে হয় হেঁটে অথবা বর্তমানে যে কোন যানে এই গোপালদাসপুর গ্রামে আসতে হবে।

ব্রাহ্মণ যে মূর্তিতে রাখালরাজের দর্শন পান, তার বর্ণনা করা মাত্রই স্থির হল নিমকাঠের ঐ দারুমূর্তি নির্মিত হবে। বাঘনাপাড়া, কোন এক সাধু খাঁ পরিবারের মিস্ত্রী এই মূর্তি তৈরী করতে পারে। বাঘনাপাড়াতে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে একটি সাত বছর বয়সের বালকই এই মূর্তি তৈরী করে দেবে। কারণ স্বয়ং রাখালরাজের সেই বালকই স্বপ্নাদেশ পেয়েছে। আর ঐ যমুনাতেই তিনটি নিমকাঠ ভেসে উঠবে। সেই কাঠ থেকেই ঐ সাধু খাঁ পরিবারের সাত বছরের বালক বাবা রাখালরাজের মূর্তি নির্মাণ করবে। কাহিনীটি খুবই দীর্ঘ। আজও সেই ঐ পরিবার থেকেই প্রতি বারো বছর অন্তর ঐ মূর্তিরই প্রতিমূর্তি তৈরী করা হয়। আর সেই গোস্বামী পরিবারের বংশধরগণ আজও বাবা রাখালরাজের সেবাইত।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করছি। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কাহিনী কিছুটা শুনেছিলেন এবং বাকীটুকু তিনি তাঁর অসুস্থ বন্ধু চরণের মুখ থেকে শুনে খুবই আনন্দিত হন। শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে মামাবাবু বলে উঠেন-

সেই কি তুমি প্রেমের ঠাকুর, বৃন্দাবনের দুষ্টুছেলে।

বাজিয়ে বেণু, চড়িয়ে ধেণু, রাখালরাজ নামটি পেলে।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত মলিনতা কেটে মনের পবিত্রতা তৎক্ষণাৎ ফিরে এল। উপস্থিত যাঁরা আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, তাঁরাও এই দৃশ্যের অংশীদার হলেন এবং লাভ করলেন অমৃতের কণা।

আমাদের কাছে এটাও এক স্মরণীয় ঘটনা।

—

মর্তেষু অমৃতম্
(শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনলীলা)
মৃ ণা ল কা ন্তি ভ ট্টা চা র্য্য
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে বছর ঘটল আর এক মস্ত ঘটনা। নিদারুণ রোগে তাঁর ডান চরণটি চিরতরে খোঁড়া হয়ে গেল। সাইনোভিটিস রোগে পুঁজ রক্ত জমে ডান পা ফুলে ঢোল হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা। ঠাকুর কিন্তু সর্বদা রাম রাম রাম জপ করে চলেছেন। তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার সৌরিন্দ্রবাবু এসে দেখে বললেন—'বড় কঠিন কেস। অপারেশন করতে হবে। তাতে জীবন সংশয় হতে পারে।' ঠাকুর বললেন— 'কর অপারেশন।' ডাক্তার বললো—'তার আগে অজ্ঞান করতে হবে।'

প্রভু কহে অজ্ঞানের নাহি প্রয়োজন।
চালাও ছুরি ও কাঁচি পারহ যেমন॥

ডাক্তার ভয় পেয়ে গেলেন। এত বড় কেস অজ্ঞান না করে অপারেশন করবো কেমন করে? অনেক সময় লাগবে। সহ্য করা কি সোজা ব্যাপার? ডাক্তাররাজী হলেন না। শেষে ঠাকুরের পিড়াপিড়িতে অজ্ঞান না করে শুরু করলেন অপারেশন। ঠাকুর ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। মুখে কেবল—রাম-রাম-রাম। বাড়ির সবাই ভয়ে আতঙ্কে কান্নাকাটি করতে লাগলেন—এই বুঝি প্রাণ যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে নির্বিঘ্নে অপারেশন হয়ে গেল। পুঁজ রক্তের বন্যা বয়ে গেল। নির্বিকার সীতারাম। জপেতে তন্ময়। সাধনার উচ্চস্তরে তখনও বিরাজ করছেন।

অবাক বিস্ময়ে কহে সৌরিন্দ্র ডাক্তার।
দেখিনি এমন রোগী জীবনে আমার॥
ধন্য হল আজ মোর ডাক্তার জীবন।
এতদিনে স্পর্শ পেনু অভয় চরণ॥

আরও কয়েকবার ঐ চরণটি অপারেশন করতে হয়েছে। কিন্তু কোনবারই অজ্ঞান করতে হয়নি। ঠাকুর সাধন বলে সে সময় যন্ত্রণা স্থল থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে আত্মানন্দে বিভোর থেকেছেন। যন্ত্রণার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেন নি। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা এমন জটিল হয়েছে যে—দক্ষিণ চরণটি চিরদিনের জন্য খঞ্জ হয়ে গেছে। তবুও ঠাকুরের কোন বিকার নেই। এমনই তাঁর সাধন কৌশল। এই সাধন কৌশলে সংসার সংগ্রামে সতত জয়ী হয়েছেন।

তপস্বীর তপো ভঙ্গের জন্য পদে পদে এগিয়ে এসেছে প্রতিকুল পরিবেশ। শত প্রতিকুলতার মধ্যেও এগিয়ে চলেছেন ঠাকুর আপন লক্ষ্যে। সংসারে যা কিছু ঘটেছে সবই শুভ, ঈশ্বরের দান বলে মাথা পেতে নিয়েছেন। রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে সদা অনুভব করেছেন কল্যাণময়ের কল্যাণস্পর্শ। নীলকণ্ঠের মত যা কিছু হলাহল নিজে পান করে দান করেছেন প্রেমামৃত। তাঁর সাধনা যে প্রেমের সাধনা। তাই সপ্রেমে সংসারের সবাইকে বেঁধেছেন। সেখানে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার কোন অভাব হয়নি। ফলে সংসার ধর্মে নেমে এসেছে একটা স্নিগ্ধতা, একটা পেবলতা, অনাবিল আনন্দ।

সীতারামের জীবনই সীতারামের আদর্শ। সেই আদর্শ দিয়ে দেখালেন সংসারে পরিহার করার কিছুই নেই, সবটাই গ্রহণীয়। আপনি আচরিধর্ম সবারে শিখান। নিজে সেই ধর্ম পালন করে জগৎকে পথ দেখালেন। বললেন—'শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে করতে যে সমস্ত কর্ম নির্বাহ করে সে অচিরাৎ ভুমাসুখ লাভে সমর্থ হয়। ভগবৎ সেবা, অতিথিসেবা, পিতৃ-মাতৃসেবা গৃহস্থগণের কর্তব্য। যে ছেলে বাবা-মাকে হর-গৌরী জ্ঞানে পূজা করে তার আর অন্য সাধনভজন করতে হয় না। ভগবান সেধে যেচে তাকে দেখা দেন। অতিথিদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। মাতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো

ভব। যে শিষ্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হয় তার আর কোন সাধন করতে হয় না। গুরুভক্ত বিনা ক্লেশে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়—অমৃতত্ত্ব লাভ করে।' মায়েদের ডেকে বললেন—'মা তোরা শাঁখা সিঁদুরে ফিরে আয়। পতিপরম দেবতা। তাকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা কর। যে স্থানে পতিব্রতা সতীনারী অবস্থান করে, রোগ শোক দুঃখ জ্বালা দূর থেকে প্রণাম করে পলায়ন করে। মা তোরা গৃহলক্ষ্মী হয়ে আনন্দে সংসার কর। সংসার মধুময় হয়ে উঠবে। বিদ্যার সংসার হবে। চিরশান্তি বিরাজ করবে। আলাদা করে সাধনভজন করবার জন্য কাউকে বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, গুহায় যেতে হবে না। এই সংসারে সেই ভগবান বিরাজ করবেন।'

''যাইতে হবে না কাননে কান্তারে,
হবে না ত্যজিতে আত্মীয়স্বজন।
কাতরে ডাকিলে সে শিব আসিবে,
নাশিবে অ-শিব পাবি শান্তিধন॥''

বেদান্ত সাধনা ও ইষ্ট দর্শন

মানুষের দুঃখকষ্ট সীতারামকে ব্যথিত করে তুলল। কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয় তার পথ খুঁজতে লাগলেন। তাই মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তাঁর যত সাধনা। ভাবলেন বেদান্তের ভাল জ্ঞান লাভ হলে মানুষের দুঃখের অবসান হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। চলে এলেন চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে। ভূদেববাবুর বাড়ী গঙ্গার উপর। সেখানে দোতলার ঘরে শুরু করলেন বেদান্তের পড়াশুনা তথা সাধনা। পূর্বাপূর্ব সাধনাগুলি যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকল—সন্ধ্যাহ্নিক, পূজাপাঠ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি কোনটাও বাদ গেল না।

বেদান্তের পড়া পড়তে পড়তে মাঝরাত হয়ে যায়। সঙ্গে দুই সহপাঠী তখন ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর শুরু হয় সীতারামের আসন সাধনা। বদ্ধপদ্মাসনে বসে জপ করতে থাকেন। জপ করতে করতে রাত গড়িয়ে প্রভাত হয়। প্রভাতে বদ্ধপদ্মাসন ছেড়ে সহজাসনে ধ্যানে নিমগ্ন হন। সকালে সঙ্গীদ্বয় ওঠার আগে সীতারাম শুয়ে পড়েন। যেন সারারাত ধরে ঘুমুচ্ছেন। সঙ্গীদ্বয় তাঁর সাধনার বিন্দু বিসর্গও জানতে পারেন না। রাতের পর রাত এমনি চলে সীতারামের সাধনা। দিনরাত অত্যধিক প্ররিশ্রমের ফলে আবার পড়লেন রোগের কবলে। রোগ তার করাল মূর্তি ধরে সীতারামকে গ্রাস করল। সীতারাম দেখলেন মৃত্যু অনিবার্য। 'মৃত্যু যখন হবেই, তখন ডাকতে ডাকতে মরি'—এই মনস্থির করে এগিয়ে চললেন। সাধনা বন্ধ হল না।

সীতারামের শরীরের অবস্থা দেখে অধ্যাপক বললেন—'সীতারাম, সন্ধ্যাহ্নিক কমিয়ে দিয়ে পড়াশুনায় মন দাও। পুস্তক মুখস্থ কর। সামনে পরীক্ষা। পাশ করতে হবে।' অধ্যাপক জানেন না যে সীতারাম তখন বড় পরীক্ষা পাশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যে পাশের পর আর কোন পাশ লাগে না।

ঈশ্বর জাগেন মনে যে বিদ্যার ফলে।
সে বিদ্যাই বিদ্যা আর অবিদ্যা সকলে॥
সেই বিদ্যা শিখিবারে প্রভুর আগ্রহ।
কঠোর সাধন তাহে যায় যাক দেহ॥

১৩২৪ সালের ২৩শে পৌষ। শীতের গভীর রাত। অভ্যাসমত সীতারাম জপে বসেছেন। বদ্ধপদ্মাসনে বসে হৃদয়ে জপ করছেন। পাশের বিছানায় সঙ্গী দু'জন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বহুক্ষণ পর বদ্ধপদ্মাসন ছেড়ে সহজাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। চোখ বুজে ধ্যান করছেন। হঠাৎ হৃদয়ে শিবের আবির্ভাব হল। কৃত্তিবাস, জটাজুট, ভস্মবিভূষিত শিব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হলেন। অপার আনন্দে সীতারামের মনপ্রাণ ভরে গেল। শিবকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলেন—'আপনি কোন জন?'

'তোমার পরমগুরু। তোমার বাল্যকালে একবার এসেছিলাম। আবার এখন এসেছি।'

'যদি গুরু হন, তবে ইষ্ট দর্শন করান।'

এ কথা বলার পর শিব পঞ্চমুখে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। আর তাঁর কাঁধ থেকে পরমাসুন্দরী জ্যোতির্ময়ী এক নারীমূর্তি নেমে এলেন। তাঁর রূপের জ্যোতিতে ঘর আলো হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে সীতারাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?'

'তোমার জননী।' বলেই হৃদয়মধ্যস্থ ছোট্ট সীতারামকে কোলে তুলে নিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। এদিকে পরমগুরু শিবও নেচে নেচে পঞ্চমুখে সেই নাম শোনাতে লাগলেন। সাথে সাথে হাতের ডমরুও বেজে উঠল—ড্রিমি ড্রিমি শব্দে। বিরামবিহীন ভাবে মন্ত্রজপ চলতে থাকল। সীতারাম পরমানন্দে শুনতে লাগলেন। পরে ধীরে ধীরে মন্ত্রলয় হয়ে রাম রাম রাম উচ্চারণ হতে থাকল। কিছুক্ষণ পর রাম রাম থেকে ওম্ ওম্ উচ্চারণ হতে লাগল। তাও গেল। ওম্ ওম্ হতে ও ও ও। তারপর ভিতর থেকে সাপের গর্জনের মত একটানা চাপা গর্জন হতে লাগল।

এ সময় সীতারামের মুদিত নয়ন খুলে গিয়ে ভ্রূর মধ্যে স্থির হয়ে গেল। ত্রাটক যোগে সীতারাম দেখলেন জ্যোতির গোলক। আজ্ঞাচক্রে আবির্ভাব হল গোলাকার জ্যোতি। দেখতে দেখতে রাজ শেষ হয়ে গেল। সম্বিৎ ফিরল ব্রাহ্মমুহূর্তে। বেজে উঠল কারখানার কলের বাঁশি। নীড়ে নীড়ে শোনা গেল পাখীর কলতান। জেগে উঠলেন সীতারাম।

জাগিলেন সীতারাম নব চেতনায়।
হৃদয় গগনে তাঁর নব সূর্য্যোদয়॥
নবালোকে হল নব জীবনের শুরু।
ছুটিলেন দিগসুই যথা দীক্ষাগুরু॥

অদ্ভুত সাধনা। এক সাথে পরমগুরু দর্শন, ইষ্টদর্শন, আত্মদর্শন, জ্যোতিদর্শন এবং ইষ্টমন্ত্র তথা নাদ শ্রবণ হয়ে গেল। যুগ যুগ সাধনার সিদ্ধি একরাতে লাভ করলেন। সীতারামের মুখমণ্ডলে তখন অপরূপ জ্যোতি। আর হৃদয় ভরে আছে রাতের সুখ অনুভূতি। পরদিন গুরুদেব যোগেশ্বরদেবের শ্রীচরণ সেবা করতে করতে ধীরে ধীরে আগের রাতের দেখা অভিজ্ঞতাগুলি একে একে বর্ণনা করতে লাগলেন। সবিস্তারে যত বলতে লাগলেন তত তাঁর মানস নয়নে সেই সব দৃশ্য উদ্ভাসিত হতে লাগল। কানে নিনাদিত হতে লাগল ইষ্টমন্ত্র সাথে সাথে ড্রিমি ড্রিমি ডমরু ধ্বনি। যুগপৎ নাদ ও জ্যোতির খেলা চলতে থাকল সীতারামের সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে। তাঁর মন অপার্থিব মহানন্দে ভরে গেল। শিষ্যের ভাবান্তর গুরুদেব প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন—সীতারাম দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে আছে। তার মুখে উজ্জ্বল দীপ্তি, তনু রোমাঞ্চিত। দাশরথিদেব বুঝলেন অনুভূত সত্যগুলি সীতারামের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছে। অভয় দিয়ে বললেন—'মা তে ব্যথা মা তে বিমূঢ় ভাব—চরৈবেতি চরৈবেতি।'—সব ঠিক আছে। কাজ চালিয়ে যাও।

সীতারাম চুঁচুড়ার টোলে ফিরে এলেন। পুনরায় পড়াশুনায় মন দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লৌকিক বিষয়ে তাঁর মন স্থির হল না। সর্বদা বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। বেদান্ত পড়া আর হল না। হবে বা কেমন করে? বেদান্ত পড়তে এসে তিনি বেদান্তের সার পেয়ে গেছেন। ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু সুধার ভাণ্ড স্থায়ী হল না। স্বাভাবিকতার সঙ্গে তাল রাখা দুরুহ হয়ে উঠল। সর্বদা ভিতরের প্রেরণায় সমাসীন। মহানন্দে কেটে যায় সারাদিন। খেয়াল থাকে না সকাল দুপুরের। কখন সকাল কেটে দুপুর হচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে, বিকেলের পর রাত, রাতের পর প্রভাত তা সীতারামের দিন পঞ্জিকাতে ধরা পড়ছে না। সর্বদা আত্মভোলা ভাব। এই সময় তাঁর কণ্ঠে এল নতুন গান। সুর সাগরে ভাসতে লাগলেন। এই সব দেখে লোকে বলাবলি শুরু করল—প্রবোধের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কথা ডুমুরদহে পৌঁছাল---সত্যিই ডাক্তারবাবুর ছেলে পাগল হয়ে গেল। বিদগ্ধ মহলেও রটে গেল—প্রবোধ ভট্টাচার্য্যমশায় পাগল হয়ে গেছেন।

রটিল প্রবোধ এবে হয়েছে পাগল।
বিষম ফ্যাসাদ তার মস্তিষ্কের গোল॥

সিমলাগড়ের জয়বাবু চুঁচুড়ার অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের কাছে শুনলেন যে—প্রবোধ পাগল হয়ে গেছে। এ কথা শোনার পর জয়বাবু যোগেশ্বরদেবকে লিখলেন—'প্রবোধ ভট্টাচার্য্যমশায় নাকি পাগল হয়ে গেছেন?' এর উত্তরে যোগেশ্বরদেব লিখলেন—'প্রবোধ কেমন পাগল হয়েছে দেখবেন।' সীতারাম যখন সিমলাগড়ে পূজা করতে গেলেন গুরুদেব তখন তাঁর হাত দিয়ে জয়বাবুকে পাঠালেন। পূজা শেষে সীতারাম

যখন দিগসুই ফিরে এলেন তখন জয়বাবুও তাঁর হাতে যোগেশ্বরদেবকে একখানি পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল—'প্রবোধ ভট্টাচার্য্য মশায়ের পাগলামি দেখলাম। মায়ের চরণে প্রার্থনা করি—আপনারা গুরু-শিষ্য দুজনেই এমন পাগল হয়ে যান।' জয়বাবু দেখলেন—প্রবোধ অন্য জগতের মানুষ। সতত ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে আছেন।

দিব্যানন্দে প্রভুদেব সদা ভরপুর।
হৃদয় বীণায় বাজে নব নব সুর॥
গুণ গুণ স্বরে গায় হৃদয়ের গান।
অপার আনন্দে ভরে তনু মন প্রাণ॥
মহানন্দে থাকে প্রভু কাটে সারাদিন।
অন্তরের প্রেরণায় সদা সমাসীন॥
শ্রীপ্রভুর রীতিনীতি বুঝে সেইজন।
প্রভু কৃপা পাইয়াছে যেই মহাজন॥

সীতারাম তখন আলোরদ্ধা জগতে বিচরণ করছেন। সারা সত্ত্বা জুড়ে নৃত্য করছে ব্রহ্মজ্যোতি। দেখছেন—'সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম।' সব জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-লতা, অগ্নি, জল, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই ব্রহ্মময়—'ব্রহ্মময়ং জগৎ।' এমনকি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ তাঁর কাছে সমান। সাম্যের চরম অবস্থা। একদিন কুকুরের সঙ্গে একাসনে বসে আহার করলেন। লজ্জা সরম ভয় ঘৃণা কিছুই নেই। একেবারে সহজসরল অবস্থা। এই সহজ অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থাতে হয় মহাভাব। যে মহাভাব হয়েছিল শ্রীরাধিকার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। এই মহাভাব হলে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয়। তখন 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে।' এই মহাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী তমাল বৃক্ষের মধ্যে দেখেছিলেন তাঁর বংশীধারীকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাগরের নীল সলিলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন করে 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভবতারিণী মন্দিরে মিউ মিউ করা বিড়ালের মধ্যে মাতৃদর্শন করে বিড়ালকে মা খা মা খা বলে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদ স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে তাঁর শ্রীহরিকে দেখেছিলেন। তেমনি ঠাকুরও ভাব সংশুদ্ধির ফলে সবার মধ্যে তাঁর ইষ্টদর্শন করতে লাগলেন। নিজেকে নিজেই দেখলেন।

শ্রীগুরু করেন পূজা বিষ্ণু মহেশ্বর।
পাদ্য-অর্ঘ্য-গন্ধ-পুষ্প দিয়া পরপর॥
দাঁড়াইয়া দেখিলেন জগৎ গোঁসাই।
হতেছে নিজের পূজা অন্য কিছু নাই॥

সেখানে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বললেন—'প্রবোধের এ অবস্থা স্থায়ী হবে না। সাময়িক ভাবোচ্ছাসে এমন হয়েছে। বিষয়ের স্পর্শে এ ভাব কেটে যাবে।' কিন্তু বৌবাজারের অতি বয়ঃবৃদ্ধ মহান জ্যোতিষী শ্রীশশীভূষণ জ্যোতিরত্ন ঠাকুরের হস্তরেখা বিচার করে বললেন—

'মহাভাগ্যবলে তদা হয়েছিল দেখা।
শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে এই রূপ রেখা॥
এবে পুনঃ দেখিতেছি একই ব্যাপার।
পরম দয়াল প্রভু এসেছে আবার॥'

জন্মান্তর দর্শন ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি

দেখতে দেখতে সরস্বতী পূজা এসে গেল। প্রতিবছর দিগ্‌সুই টোলে সরস্বতী পূজা করেন গুরুদেব। সেবার কার্যান্তরে অন্যত্র যেতে হল। টোলের পূজার ভার পড়ল সীতারামের উপর। সীতারাম মহোৎসাহে তৎপর হলেন। বিধিমতে যথাসময়ে পূজা সমাপন করে চোখ বুজে জপ করতে লাগলেন। জপ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে সমাহিত হলেন। সহসা মনের গহনে ভেসে উঠল পূর্বজন্মের স্মৃতি। চোখ খুলে দেখলেন উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেছে। আরও দেখলেন—

আলোর জ্যোতির মধ্যে যুগ-অবতার।
মিটি মিটি হাসিছেন মহিমা অপার॥
জগৎ বিখ্যাত সেই মাতৃ উপাসক।
দক্ষিণেশ্বরের তিনি মহান সাধক॥

সীতারামের স্মৃতিপটে জেগে উঠল সব ঘটনা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'মা! এ জন্মেও রেহাই দিলিনে?'

ক্রমশঃ

যে গান শোনাতে চাই

কি ঙ্ক র স মী র ণ

উপবাসী মন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাবার জন্যে আমাদের হাঁটতে হয় অনেকটা পথ। সেই পথে কখনও খুব ভীড়, কখনও ভীষণ নির্জন। যখন ভীড়ের মধ্যে থাকি তখনও আনন্দ থাকে আবার যখন একা একা নির্জনে নিজের মুখোমুখি হই, তখনই পরমানন্দের আস্বাদ পাই। সেই একা হওয়ার সুযোগটা ঘটে কই? তবু সংঘের কথা ভাবলে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটা যেন আপনা-আপনি চলে আসে। কত কাণ্ড যে ঘটে এই সংঘে!

মুকেশ চতুর্বেদীর কথা মনে আছে? শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। থাকেন ইন্দোরে। ওঙ্কারেশ্বরের মঠের সেবা করতেন এতদিন। এবার ঠাকুর ওকে ট্রাস্টি বডি-তে দায়িত্ব দিয়ে বৃহত্তর আঙ্গিনায় নিয়ে এলেন। গুরুজী অন্ত প্রাণ।

গত ভূমিকম্পে আমাদের ভেট দ্বারকার আশ্রমটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ক্ষতস্থানগুলি আমরা এতদিন পুনর্মার্জিত করতে পারিনি। মুকেশভাই, শ্রীকান্ত, সতীশভাই ও গোপালজীকে নিয়ে ২রা নভেম্বর আশ্রমে পৌঁছান। পরেরদিন ৩রা নভেম্বর নিজেরাই কর সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আশ্রম পরিষ্কার করতে শুরু করেন।

এদিকে মহেন্দ্র সিং রাণা এবং বিশিষ্ট ভক্ত, সর্বমান্য লোকপ্রিয় শ্রীপবুভা বিদ্মতা মানেকজী (গুজরাট বিধানসভার সদস্য, এম.এল.এ) ওঙ্কারেশ্বরে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ প্রান্তে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কী বিরাট কৃপা! শ্রীমানেকজী বলেন, আপনারা আশ্রমটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিন, তারপর বাকীটা আমার। পাঁচ-পাঁচবার বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ পরিচিত, বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় পবুভাজীর পিতৃদেব নরেন্দ্র মোদীজীর ব্যক্তিগত সুহৃৎ বলা যেতে পারে। সাফাই পর্ব শেষ হতে চলল। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের মহাসচিব অধ্যাপক শ্রী গোপাল মিত্র মহাশয় আনন্দিত চিত্তে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যেন এগিয়ে এসে গুরুসেবা করে ধন্য হন। আমাদের সর্বাধীশজী যেমন বলেন, গুরুসেবায় নিজে অংশগ্রহণ কর এবং অপরকে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দাও।

নদীর কাছ অমৃত ভিক্ষা করবেন না? সেই অমৃত, যা বিখ্যাত সাহিত্যিক কালকূট 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখে গেছেন, পেতে গেলে যেতে হবে উজ্জয়িনীতে ২০১৬ সালে। কিঙ্কর বিঠ্ঠলজী জানিয়েছেন জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে। মনে রাখতে হবে এপ্রিল-মে ২০১৬। আসুন, আমরাও প্রস্তুত হই সেই পরমানন্দের রাস্তায় হাঁটার জন্যে। দশ দিগন্তের সাধুদের দেখবো। অন্য জীবনচর্চায় মগ্ন মানুষগুলোকে দেখবো, তাদের সান্নিধ্যে আসবো। স্বাদ নেবো মহাকুম্ভ স্নানের মাধুর্য ও মহিমার!

বেহালার রক্তিম আমাকে নিষেধ করেছিল তাড়িঘাটের মহাপ্রয়াণ মঠটাকে যেন প্রচার মাধ্যমে ফোকাস না করি। বলেছিল, দেখ ওটা ভার্জিন মঠ, ওখানে প্রচারের আলো ফেল না। কিন্তু আমি কি করবো শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা যে অন্য রকম। স্বয়ং মহারাজকে দিয়ে মহাপ্রয়াণ মঠে সংস্কার কাজে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করালেন। নিতাইকে ত্যাগ বস্ত্র দিলেন। নিতাইও তেমনি। পুরো কার্তিক মাসটা ধরে ওখানে অখণ্ড নামকীর্তনের মঞ্চ সৃষ্টি হয়ে গেল। জব্বলপুরের ভায়েরা খুবই উদ্যোগ নিয়েছেন। উপাধ্যায়জীর নিরলস সেবা এবং পরিশ্রম স্বয়ং মহারাজ সকলকে ডেকে ডেকে বলছেন। ওখানকার ভায়েদের সকলের নামগুলো মনে করতে না পারলেও অভয় সিং-এর নাম আমরা ভুলবো না। পরেরবার ঐ নামগুলো উল্লেখ করার ইচ্ছে রইল।

কালনার গৌরাঙ্গ মঠেও শ্রীমধুসূদন দাদার নেতৃত্বে চাতুর্মাস্যের নাম সুসম্পন্ন হল। ওঙ্কারনাথ মিশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নয়নভাই, শ্রীধ্রুব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যুবক সংঘ, ওঙ্কারনাথ মিশনের কোষাধীশ কিঙ্কর দীপক দেবনাথ, 'পথের আলো'র কর্মকিঙ্কর শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি গৌরাঙ্গ মঠের সকলের আনন্দ বর্ধন করে। মুম্বাইয়ের সমীরকুমার ভাই, কালনার মানিক কুমার ভাই এর সহযোগীতার কথা উল্লেখ করতেই হয়।

বিঠ্ঠলজী বেশ বলেন, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, শ্রীনামপ্রচারে আমরা শতকরা আশিভাগ পেয়েই আছি কিন্তু লোকসেবার ক্ষেত্রে আমরা বেশ পিছিয়ে। মাত্র শতকরা কুড়িভাগ নম্বর পাচ্ছি। পাশ করতে পারছি কই? অথচ ঠাকুর আমার বলছেন, 'পরই পরমেশ্বর'। তিনি স্বয়ংই লোককল্যাণ বিগ্রহ। তাঁর সেবার সীমা পরিসীমা নেই। তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ।

লোককল্যাণে যেন ওঙ্কারনাথ মিশন সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেই আহ্বানই উনি জানাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। গতবার কালনায় এসে সেখান থেকে ছুটে গেলেন রামনগর ওঙ্কারনাথ আশ্রমে। বৈদ্যপুরের কাছে। শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ওখানকার আশ্রমসেবক। ওঙ্কারনাথ মিশনকে এই আশ্রমটি দেবার কথা হয়েছে। মহারাজজী চাইছেন এখানে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠুক। আজকের এই স্বাস্থ্য-সন্ত্রাসের যুগে কিছুটা হলেও যেন গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়। গ্রামের লোকেরাও মহারাজের কথায় খুবই আনন্দ পেয়েছেন। তারা উৎসাহ ভরে ঐ আশ্রমে প্রায়ই শ্রীনামের মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে শ্রীনামকীর্তনে অংশগ্রহণ করছেন। নাম করতে করতে মানুষ বুঝবেন, উপলব্ধ সত্য সর্বদা ঋজু, সরল ও সহজবোধ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, ''আমি সত্য করে বলছি—যারা আমার নাম করে, তারা পাষাণ কাষ্ঠের সদৃশ হলেও মরণকালে আমি তাদের অভীষ্ট দান করি। নাম কর, অবিরাম নাম কর—আমি সব ভার গ্রহণ করবো। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি।''

এবারে মহারাজ ওঙ্কারেশ্বরে যাবার প্রাক্ মুহূর্তে মিশনের সব সেবকদের ডেকে বলেন, নন্দদুলাল মন্দিরে (সাঁইবোনা) মিশনের যে সেবাকেন্দ্রটি অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, তা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা কর। যত দ্রুত সম্ভব ছাদ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা কর। ওখান থেকে প্রান্তিক মানুষদের আরও বিস্তারিতভাবে স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়া যাবে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন পথিক বাসা বেঁধে আছেন। তিনি আছেন বলেই আমরা হাঁটতে ভালবাসি। ভুল রাস্তায় গেলেও তিনিই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনিই আমাদের চনমনে করে রাখেন। সেই চনমনে ভাবটাকে আবার উস্‌কে দেন মহারাজজী। হঠাৎ একদিন ফোন বেজে উঠল। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল মহারাজজীর কণ্ঠস্বর—কি ঘুমোচ্ছ?

—প্রণাম, প্রণাম।

—আরে ভাই উঠে পড়, গাড়ীটাকে নাও, দুলাল, দেবী, দেবনাথ, অরবিন্দকে নিয়ে শান্তিপুরের রাসমেলায় যাও। ওখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বইগুলো নিয়ে একটা স্টল করে বসে পড়।

—কোথায় থাকবো, কোথায় খাব? আর কত হাঁটবো? বয়স হল তো!

—তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শুধু বইগুলো নিয়ে চলে যাও। কৃপানন্দজীর নাম শুনেছ তো?

—কী যে বলেন? কৃপানন্দজীর নাম শুনবো না? ডুমুরদহের শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা পার্ষদ পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীঠাকুর দত্ত নাম। তখনকার দিনের বিখ্যাত সাহিত্যিক। নামপ্রেমী ওঙ্কারনাথের লেখক।

—ঠিক বলেছ। পুরঞ্জয় দাদুকে শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট গীতাটি উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রটি দেখে নেবে—।

—ফোন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে নিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখছেন—''শ্রুতির সুধা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। গীতার অমৃত—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সতং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই দুইটি মন্ত্র।

শেষটি বৈষ্ণবগণের চরম মন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীভগবানের হৃদয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়নশীল।

শ্রী ভগবানের অতি প্রিয়তম,

তোর নামে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাখানি উৎসর্গ করিলাম।

''চরণ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমৃদুম্বরম্

সূর্য্যস্য পশ্য প্রেমাণাং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥

চরৈবেতি চরৈবেতি॥ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

আহা! কি অপূর্ব বাংলা করলেন ঠাকুর— লিখছেন—''চলাটাই অমৃতলাভ। চলাটাই হল তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখ ওই সূর্য্যের আলোকসম্পদ—যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েনি; অতএব এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্—''

দীপক দেবনাথ, অরবিন্দ দাদা আর সুবীর শেঠ গেলেন ওঙ্কারেশ্বরে, দেবী আর কিঙ্কর সমীরণ চলল রাসমেলার দিকে। মহামিলন মঠ থেকে আমাদের ওঙ্কারনাথ মিশনের গাড়ী এগিয়ে চলল শান্তিপুরের দিকে। রাসমেলার প্রাঙ্গনে। অনন্তময়ের অনন্তলীলা। শুধু যোগ দিয়ে কৃতকৃতার্থ হওয়া।

বড় গোস্বামী মন্দিরে আমাদের স্টল হয়েছে। দুইদিক ঘেরা, দুইদিক খোলা। স্থানীয় ভক্তেরা একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন আমাদের দেরী হচ্ছে দেখে। দুখানা ব্যানার ঝপাঝপ টাঙ্গান হয়ে গেল। টেবিলে বই সাজান হল। একটা বড় র‍্যাকে একটি কালার টিভি আর ঠাকুরের সব ছবি। আর আড়াই হাজার অভয়বাণী। অরবিন্দদা ছাপিয়ে এনে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি চেয়ারে বসান হল।

একটু বাদেই এলেন বড় গোস্বামী মন্দিরের পান্নাদা। অপূর্ব দর্শন, সুন্দরকান্তি। সংসারবুদ্ধি ত্যাগী, পরার্থ প্রেমিক। উদবোধন করলেন আমাদের স্টলের। একটি পুষ্পস্তবক দেওয়া হয়েছিল ওঁর হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপটকে প্রণাম করে সেই পুষ্পস্তবকটি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করলেন।

এখনও এই বাংলায় কতজন আছেন যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিটা পর্যন্ত দেখেনি, নাম শোনা তো দূরের কথা! যারাই স্টলের কাছে এলেন তাদেরই একটা করে অভয়বাণী দেওয়া হল।

একটা বিশাল ফুটবল খেলার মাঠ জুড়ে মণ্ডপ করা। দূর দুরান্ত থেকে ভক্ত সাধারণ আসছেন। একটা প্লাসটিক বিছিয়ে সব শুয়ে পড়ছেন। সরল, লাজুক লোকগুলো কোলে-মাথায় পুঁটলি নিয়ে ডেলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ছে। রাসের মেলায় এসে এরাই সত্যিকারের পুণ্য সঞ্চয় করছে। হঠাৎ দেখি বিশাল ঢাকের মিছিল ঢুকছে মণ্ডপের পাশ দিয়ে। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার করতে করতেই দেখি—এক বুড়ো ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, চলুন আপনাকে নিয়ে দেখিয়ে আসি। হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন, বড় গোঁসাই সমস্ত পাড়া শহরকে ঢাক বাজিয়ে নেমন্তন্ন করে এলেন, আমার বাড়ীতে রাস বসেছে, তোমরা সবাই দেখতে এস।'

আগে একশো ষাট-সত্তরটা ঢাক বাজত। এখন সেটা কমে একশো আটে এসে দাঁড়িয়েছে। দুধারে গ্যাসলাইট জ্বলছে।

এখনও রাধারাণী গোবিন্দজী মঞ্চে এসে বসেন নি। বাড়ীর ভেতরেই আছেন। মূল ফটকের বামদিকে একটা তমালগাছ রয়েছে। তারই তলায় বড় গোঁসাই সপার্ষদ বসে আছেন। মালসায় রয়েছে ভোগ কলাপাতা চাপা দেওয়া। চার-পাঁচটা আসন পাতা। ভারী কাঁসার গেলাসে জল দেওয়া। একদল ভক্ত গোঁসাইদের ঘিরে ধরে সুর করে গাইছেন। ফাঁকায় পেয়ে গেলাম রাধারাণী আর গোবিন্দজীকে প্রচুর গয়না পরেছেন। এখানে সবাই খুব সাজগোজ করেছেন। এলাকার মায়েরা পর্যন্ত। সবারই রাধাভাব। রাধারাণী কেবলই শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম করে চলেছেন। সমস্ত তনুমন কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। সিংহাসনে বসে দর্শন দিচ্ছেন। যুগলমূর্তি দর্শন করে ভক্তেরা আপ্লুত।

এদিকে সানাই বেজে উঠল। রাস শুরু হয়ে গেল। ডেলা পাকানো লোকগুলো কীরকম ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনোদিন ভাবিনি রাসে শান্তিপুরে আসবো। এইসব মেলাগুলোতে সনাতন ভারতকে দেখা যায়। সনাতন ভারতের প্রকাশ্যরূপ।

অনেক রাত্রে আমরা ক্যাম্পে ফিরলাম। ক্যাম্প মানে চাণক্য দা'র বাড়ী। সপরিবারে বিঠ্ঠলজীর কাছে এরা মন্ত্র পেয়েছেন। ছিল একটি রাজনৈতিক পরিবার, ঠাকুরের আশীর্বাদে হয়ে গেল ভক্ত পরিবার। মধ্যরাতের চাঁদের ভরা যৌবন শান্তিপুরের সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে।

শরীর ক্লান্ত ঠিকই কিন্তু ক্লান্তিবোধই নেই।

পরেরদিন পান্নাদা প্রসাদের আহ্বান জানালেন। চাণক্যদা বললেন, আপনারা অতি ভাগ্যবান। সকাল থেকেই স্টলে, রাত দেড়টায় বাড়ী ফেরা। পরেরদিন ভাঙ্গা রাস দেখা হল না। ভীড়ের ভয়ে পালিয়ে আসা। রামাশ্রমে প্রসাদ পেলাম। আদি আশ্রম শ্রীরামাশ্রমে সংস্কারের কাজ চলছে। এখানে মা অন্নপূর্ণা, ব্রজনাথজী, শিবজী প্রতিষ্ঠিত হবেন। তাড়িঘাটে মহাপ্রয়াণ মঠে একমাস (পুরো কার্তিক মাস) শ্রীনাম সংকীর্তন যজ্ঞ হল। সংক্রান্তিতে শেষ। কিঙ্কর নিতাই, আশ্রমসেবক খুব আদর করে সবাইকে ডাক দিয়েছে। সব খবর ইউ টিউবে দেওয়া আছে।

'পথের আলো' পত্রিকা আশ্বিন সংখ্যায় এ.বি.জে.এস-এর মহাসচিব অধ্যাপক গোপাল মিত্র মহাশয় মধুপুরের শ্রীগুরুধাম আশ্রম সম্পর্কে যে নিবেদনটি জনসমক্ষে রাখেন তাতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পত্তি কিছু দুষ্কৃতকারী চক্রান্ত করে, জালিয়াতি করে গ্রাস করতে চাইছে, অপরদিকে তারাই আবার মুখোশ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মীয় সাজতে চাইছেন। থানা-পুলিশ চলছে। আইন-আদালত তো রয়েছে। সারা ভারত নাম প্রচারক কিঙ্কর বিরাগানন্দ, অনিরুদ্ধস্বামী, কিছু নামপ্রেমী সেবকদের নিয়ে নিজেদের আশ্রমে শ্রীনামকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করতে গেলে জনৈক আশ্রম সেবক এবং তার স্ত্রী রীতিমত বাধা দান করেন। অশ্রাব্য, অশ্লীল গালিগালাজের দ্বারা নামকারীদের অভ্যর্থনা করেন। প্রত্যেকেই খুব অবাক হন। ভাবেন একি পরম্পরা? তবে উপস্থিত নামকারীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক লীলা দর্শন করে ধন্য হন। গ্রামের সমস্ত লোকেরা আশ্রম সেবকের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। বিরক্ত সংঘের সম্পাদক কিঙ্কর জনার্দন বেশ কিছুটা আহত হন আর তার সাথে সাথে ওর ভিডিও ক্যামেরাটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে ঐ মহিলা তো থামতে চাইছেন না! তিনি অশ্রাব্য গালিগালাজ আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেই চলেছেন। শেষে নামকারীদের মধ্যে থেকে আওয়াজ ওঠে জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! যত জোরে উনি গালি দেন ততই জোরে ধ্বনি ওঠে জয় সীতারাম! একটা সময় পরে গোখরো সাপ নেতিয়ে পড়ে। নামকারীদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অহিংসক থাকার ফলে গ্রামবাসীরা ক্রমশ শান্ত হন। ক্রমশঃ নিজেদের ভুল তারা বুঝতে পারেন। পুলিশ আসে। শেষে ঠিক হয় আশ্রমে নাম চলবে। কারুর ক্ষমতা নেই শ্রীনামকে বন্ধ করার। হঠাৎ গ্রামবাসীদের বিরোধিতার মুখে পড়াতে একটা ভয় সকলকে গ্রাস করছিল। এক মুহূর্তের জন্য হলেও নামকারীরা ভয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী সকলেরই জানা আছে—''ইহা তুই স্থির জানিস্—তুই আমার কোলে আছিস, আমি তোকে বুকে করে রক্ষা করছি। নাম কর, নাম কর।"

যারা নাম করেন তাদের মৃত্যুভয় থাকে না। ''থাকে শুধু একটা ঘটনা ঘটতে থাকার মধ্যে অসাড় হয়ে ঢুকে যাওয়ার ভয়। সেই ঘটনার আকস্মিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষ শুধু আকুলি বিকুলি করে।"

খুব জোর নাম হচ্ছে। বাঙালি ধর্মশালা থেকে শোনা যাচ্ছে। তনুশ্রী গান ধরেছে—''আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে।" সঙ্গে গীতা, গোপা, রাধা, ঈশিতা গুণগুণ করছে আর ''মধুপুরার" নির্জন প্রকৃতিকে শুধু দুচোখ ভরে দেখছে। ভাবছে এই আশ্রমেই শ্রীশ্রীঠাকুর কতদিন নির্জনে মৌন নিয়ে অজ্ঞাতবাস করেছেন। পরাঙ্কুশস্বামীও এখানে কত তপস্যা করেছেন। সেই বেলগাছটা এখনও আছে যার তলায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

—কে একজন প্রশ্ন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমে এত অশান্তি কেন?

—এটা অবহেলার ফল। দীর্ঘ অবহেলার একটা শোধ নিল আশ্রম। আশ্রমও অবহেলা সহ্য করতে পারে না। ট্যাক্স দেওয়া ছিল না, মিউটেশন করা হয়নি, এই সুযোগে চক্রান্তকারীরা জালিয়াতি করে বলছে—''আমরা আমাদের...সম্পত্তি বিক্রি করছি।" মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে

'শ্রীগুরুধাম' লেখা পাথরের ট্যাবলেটটি। দুষ্কৃতকারীরা দেওয়াল থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। ওই আশ্রম ভেঙ্গে ওখানে লেডিস হোস্টেল হবে! মধ্যে পাঁচিল তুলেছে।

মহারাজ অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সকলকে, সমস্ত আশ্রম সেবকদের সচেতন হতে বলেছেন। যে সমস্ত আশ্রম, মঠ, মন্দিরের খাজনা (ট্যাক্স) বাকি আছে, মিউটেশন করা হয়নি সেই সমস্ত সেবকদের অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়, মহামিলন মঠে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সদাসর্বদা সতর্ক থাকার জন্যে সকলকে আহ্বান জানান হচ্ছে যাতে করে আমাদের সামান্যতম দুর্বলতার জন্যেও দুষ্কৃতকারীরা কোনোরকম জালিয়াতী করার সুযোগ না পায়।

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের কর্তা কেউ নন। কর্তা একজন। তিনিই সব দেখছেন, শুনছেন এবং করছেন। তবে কেন এত জ্বালা? তিনি অপেক্ষা করেন, ধৈর্য্য ধরেন। যতক্ষণ না পুণ্যের ফলটা খরচ হয় ততক্ষণ তিনি সব সহ্য করেন। মনে রাখতে হবে রাবণের পুণ্যের জোর যতদিন ছিল ততদিনই রাবণ রাজত্ব করেছিল তারপর ভগবান ওঁকে শাস্তি দেন।

ওঙ্কারেশ্বর থেকে গোটা সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেওয়া—এ কি কম কথা! উনি বলছেন, এটা কর্মের যুগ। তপস্যা কর, তপস্বী হও। যে যত তপস্যা করবে সেই তো শ্রেষ্ঠ হবে। কুলীন হবে, সেই তো পূজা পাবে। ওঙ্কারনাথ মিশনের সেবকরা যেন তপস্বী হয় পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। নিষ্কাম কর্মী হয়। মনে রাখবে ঠাকুরেরই কথা তপস্যার শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

বংশগত কৌলিন্যের কোন কদর থাকে না, যদি না সেখানে তপস্যা থাকে, সংস্কৃতি থাকে, জীবনচর্চা থাকে।

''মানুষের মত মানুষ হলে ভাঙ্গার মত ভাঙ্গা যায়, গড়ার মত গড়া যায়।'' যাদের মধ্যে তপস্যার শক্তি সঞ্চিত হয়নি তারা কিছু ভাঙ্গতে গেলে ভাঙ্গতে পারে কই? যতটুকু আঘাত তারা দিতে চায় তার শতগুণ আঘাত তারা ফিরে পায়। মধুপুরে রাত্রে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। নাম চলছে। বহুদিন বাদে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বামপাশে রেখে লক্ষণজীকে নিয়ে শ্রীনাম শুনছেন। বড্ড প্রসন্ন নয়ন তাঁর। শ্রীনামের তরঙ্গে ভাসছে প্রত্যেকের দেহমন। দেবী, নয়ন, রতন, মৃণাল, বিজয়, শীলদা, দুলাল, সেনশর্মাজী, সুশান্তদা প্রত্যেকেই এখন একা। নিজেদের মধ্যে ডুব দিয়ে এক চিদানন্দময় আনন্দকে ধরেছেন। ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে ক্ষুদ্র আমিগুলো। চারদিকে মহাশূন্যতা। দিগন্ত যেন নেমে এসেছে ওদের মাথার ওপরে।

হালিশহর চৈতন্যডোবায় নগর সংকীর্তন

চৈতন্যডোবা সৃষ্টির পাঁচশ বছর পূর্তি উপলক্ষে হালিশহরে ১৭ই অক্টোবর, শুক্রবার থেকে ২১শে অক্টোবর মঙ্গলবার পাঁচদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্থক রূপদান হয় নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে। ১৭ই অক্টোবর সংকীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীশচীদানন্দ ব্রহ্মচারী। কীর্তনে ৪২টি শ্রীখোল, ৪২টি করতাল সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। পথ পরিক্রমা চৈতন্যডোবা - নিগমানন্দ মঠ - পূষন আশ্রম - সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির - কোনা মোড় যোগনন্দ আশ্রম - জগন্নাথ ঘাট - অনুকুলচন্দ্রের মন্দির (চক্রবর্তী পাড়া) - সরকার বাজার - রামপ্রসাদ ভিটা - চৈতন্যডোবা।

২১শে অক্টোবর দুটি ভিন্ন পথে পরিক্রমা হয়। প্রথমটি চৈতন্যডোবা - আচার্য্য পাড়া - শিবমন্দির ঘাট - জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘ - রথতলা কৃষ্ণরায় মন্দির - বাগ মোড় - চৈতন্যডোবা। খোল ১৪টি, করতাল ২৫টি, হারমোনিয়াম ৪টি। দ্বিতীয়টি অতি অভিনব সাজে পথ পরিক্রমা করে। চৈতন্যডোবা - বাগমোড় - গান্ধীমোড় - থানামোড় - ডাঙাপাড়া - তেঁতুলতলা - চৈতন্যডোবা। প্রথম পুলিশ ভ্যান, দ্বিতীয় ব্যান্ডপার্টি, তৃতীয় ঘোড়ায় টানা রথ। রথে সুসজ্জিত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, একটি ম্যাটাডোর ও একটি ভ্যান রিক্সা, সঙ্গে নামের দল, শেষে অ্যাম্বুলেন্স।

প্রত্যেকটি নামের দলে কমবেশী ১৫০জন ভক্ত অংশগ্রহণ করে এবং কমবেশী ছয় কিমি. পথ পরিক্রমা করে ৩ ঘণ্টার বেশী সময়ে। ২১শে অক্টোবর পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করে মহামিলন মঠ এবং ওঙ্কারনাথ মিশন, হালিশহর, নৈহাটী, কাঁচরাপাড়া, সীতারাম সম্প্রদায়, মগড়া। কমবেশী ওঙ্কারনাথ আশ্রিত ১০০ জন ভক্ত দ্বিতীয় দিনের নগরে অংশ নেয়। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও ওঙ্কারনাথদেবের সুধার ধারা প্রচার ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অবক্তনীয় নাম, অবক্তনীয় ঠাকুরের লীলা অনুভবে আসে আর মনে হয় এই কর্মে যুক্ত থাকাই কর্মযোগ।

শ্যামাপদ নাথ, চৈতন্যডোবা, হালিশহর।

কবির কল্পনায় কোন যুগ হতে বিজয়ার প্রণাম, প্রীতি সম্ভাষণ শুরু হয়েছিল সংক্ষেপে তার বর্ণনা করা হল

কি ঙ্ক র বি পু লা ন ন্দ

দ্বারী ছিল শ্রীকৃষ্ণের জয় ও বিজয়
মুনিগণ অভিশাপে পতিত উভয়
অরিরূপে তিনজন্মে মর্ত্যভূমি এসে
দেহান্তে উভয়ে শাপমুক্ত হল শেষে
রাবণ ও কুম্ভকর্ণ দুইটি তনয়
রামের পরশে মুক্ত করে দয়াময়
বিশ্বশ্রবা পুত্রতরো নিকষা জননী
প্রবল প্রতাপশালী রামায়ণে শুনি

অভয়া দুর্গার বরে দশানন নাহি ডরে
অজেয় হইল ত্রিভুবনে
রাবণেরে বধিবারে রাবণারি পূজে যারে
(শারদীয়া) দুর্গা বলে জানে সর্বজনে।
বরষ বরষ পরে আসে মা দুবার ধরে
সন্তানেরে দানিতে অভয়
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি পূজে যত নরনারী
মা, মা বলে হয়রে নির্ভয়।
মৃন্ময়ীর মূর্তি গড়ি কুম্ভকার দিল খড়ি
রঙে সাজে করিল ভূষিতা
সাধক সাধিকা যারা চিন্ময়ীর পায় সাড়া
অভীষ্ট দানে যে দক্ষসূতা।
ষষ্ঠীতে বোধন করে আবাহনে তার পরে
অধিবাস করে শেষে মাকে
সপ্তমীর শুভক্ষণে পূজকের মন্ত্রদানে
প্রাণ চক্ষু দানে যে চণ্ডীকে।
অষ্টমী নবমী দিনে ছাগ্ মোষ কেহ মানে
রিপুগণ নাশিবার তরে
ষোড়শাদি উপাচারে নৈবেদ্যাদি দিয়ে তারে
গন্ধে পুষ্পে পূজে মা দুর্গারে।
পূজা সাঙ্গ হলে পরে মিষ্টিমুখ করে তারে
বিসর্জন করে নদীতীরে।
পরদিন বিজয়াতে কত কিছু দেয় খেতে
প্রণতি জানায় নতশিরে।
কেহ প্রীতি আলিঙ্গনে দু'বাহু বাড়ায়ে টানে
ভুলে যায় কলহ বিবাদ
কবে কোন যুগ থেকে এ নিয়মে বাঁধা লোকে
কোন্ শাস্ত্রে নাই অনুবাদ।
কেনবা বিজয়া পরে হিন্দুদের ঘরে ঘরে
প্রণাম ও আলিঙ্গনে সবে
আরও তো আছে পূজা বিজয়াতে করে মজা
সম্ভাষণ হয়েছে কি কবে?
(তাই) কবির কল্পনা দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে
নিরালায় করিনু বিচার
পাঠক, পাঠিকা যারা যদি ভুল ভাবে তারা
প্রতিকার করিবে ইহার।
যুগ যুগান্তর ধরে অসুর দলন করে
সাধুগণে করে পরিত্রাণ
তাই এসে বারে বারে রাম, কৃষ্ণ অবতারে
বাণে চক্রে বধিয়াছে প্রাণ।
ত্রেতায় জন্মেছে রাম দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নাম
কলিতে হলেন নিমাই
জগা, মাধা উদ্ধারিতে এল প্রভু নদীয়াতে
চরণে যবনে দিলেন ঠাঁই।
(একদা) বিরিঞ্চি বিপদ নিয়ে ক্ষিরোদ সাগরে গিয়ে
করে স্তব বিষ্ণু ভগবানে
রাবণের অত্যাচারে গৈল সব ছারখারে
রাখ প্রভু তোমার সন্তানে।
তাই বিষ্ণু অংশে রাম জন্মিল অযোধ্যায়
ক্ষাত্রবংশে অযোধ্যা নগরে
দশরথ পুত্ররূপে বধিতে রাবণ ভূপে
তারি অংশ বিমাতার ঘরে।

কৌশল্যা জননী তার ভরত কৈকেয়ী মার
সুমিত্রার শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণে
পিতৃসত্য পালিবারে চৌদ্দ বৎসর ধরে
বনবাসী হল ভার্য্যাসনে।
রাম, সীতা পূজিবারে রামানুজ গৃহ ছেড়ে
অগ্রজেরে করিল স্মরণ
প্রণমিয়া গুরুজনে চলেছে প্রসন্ন মনে
কাঁদে পুরবাসী জনগণ।
হেরে কত নদনদী কত তীর্থ সাগরাদি
সরোবর, পাহাড়, ভূদর
রাক্ষসাদি বধিবারে শয় ধনু নিয়ে কড়ে
ভ্রমিছেন বন বনান্তর।
লক্ষ্মণ নিয়ত মানে ইষ্ট দেবদেবী জ্ঞানে
পূজে রাম, জানকী মাতারে
ফলমূল যাহা পায় রাঘব বাটিছে তায়
ধর বলি চেয়ে অনুজেরে।
একদা দণ্ডক বনে তাতি হরষিত গণে
উপনীত হন তিনজনে
পথে যেতে কত কত রাক্ষস বাণেতে হত
হেরে সীতা কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
রামের এ আগমন তরিবে পতিতজন
মনে মনে এই অভিলাষ
কৈকেয়ী নিমিত্ত মাত্র ভরতে মাগিছে ছত্র
রাঘবেরে দেয় বনবাস।
চৌদিকে হেরিছে তারা ফলফুলে আছে ভরা
বন উপবনে বিজড়িত
হেরে কোথা তপোবন ধ্যানে রত মুনিগণ
সামগানে কোথা মুখরিত।
কুটিরের চতুষ্পার্শে ময়ূর, হরিণ এসে
জানায় বারতা নিজ স্বরে
মুনিগণ স্নেহভরে দেয় খেতে সবাকারে
আদর করেন নিজকড়ে।
রাঘবে হেরিবে বলে মহাবীর পালে পালে
প্রণতি জানায় নতশিরে
রাঘবের আগমনে ছুটে যায় মুনিগণে
স্তব স্তুতি করে তারে ঘিরে।
বিচিত্র বিহগগণে চিনিল আপনজনে
কলরব করে গাছে গাছে
অলিকুল বেগে ধায় দেখিবারে রঘুরায়
ফুল মধু ত্যজি তার কাছে।
এ হেন এ সুসময় ঘটিল প্রমাদতায়
একে একে করিনু বর্ণন
পূর্ণব্রহ্ম ভগবানে পূজে যারা একমনে
তার ভার্য্যা হরিল রাবণ।
তাই রাম শত্রুরূপে বধে দশাননভূপে
শূন্য করে স্বর্ণলঙ্কাপুর
স্বামী ও দেবর সাথে সীতা এল অযোধ্যাতে
উলুধ্বনি করে অন্তঃপুর।
প্রথমে বিমাতাপাশে জননীরে অবশেষে
বন্দিল চরণ নতশিরে
পিতৃসত্য হল পূর্ণ কৈকেয়ীর দর্পচূর্ণ
করে পুত্র ক্রোধে জননীরে।
তবু মাতৃবাক্য নিয়ে দু'ভ্রাতা অযোধ্যা গিয়ে
পালে প্রজা শত্রুঘ্নকে লয়ে
রাঘবের আগমনে অতি আনন্দিত মনে
দণ্ডবৎ প্রণমিল দুয়ে।
অযাতির অবসান দেশবাসী পেল প্রাণ
ধন্য ধন্য কহে মুনিগণে
দিকে দিকে পড়ে সাড়া রাম লোভে ছুটে তারা
আনন্দে মাতিল ত্রিভুবণে।
প্রণমিত দলে দলে জয় রাম জয় বলে
প্রভু সবে করে আলিঙ্গন
মনে হয় ত্রেতাযুগে ছিল না ইহার আগে
শারদীয়া প্রীতি সম্ভাষণ।

শ্রীধাম

কি ঙ্ক রী উ মা

‘ধামের’ সাথে ‘শ্রী’ এর পাশে
লীলাময় যেথা করে বিহার।
সেই তো যমুনা শ্রীব্রজের দেশে
নামের মহিমা করে প্রচার।
জাহ্নবী, যমুনা এক হয়ে যায়
নতুন লীলার তরে সেথায়
এখনও বিটপী বকুলের ছায়
শ্যামলী, ধবলী, ঘোরে নেশায়।
সেই সে পুলিন সেই যে বাঁশরী
রাধা রাধা বলি কাহারে চায়
উজান বাহিয়া ভাবের দিশারী
নবরূপে সাজি আজিও মাতায়।
রাধার নামের মধুর শ্রবণে
বাঁশরী কি যেন বলিয়া যায়,
সমধুর নামে হৃদয় কাননে
রাধা রাধা নাম প্রাণে জাগায়।
কালিয়া কোথায় কি যেন নেশায়
রহে গো কেমনে বুঝিতে নারি
নহে তো সুদূরে কে যেন শোনায়
অন্তরে বসি রহে গো পাশায়।
আজিও ব্রজের রাসলীলা হেরি
নিতুই মদুর মিলনরাতে
বাজায় বাঁশরী শ্রীরাধারে স্মরি
প্রেমের নাথ প্রেমের সাথে।
প্রেমের দেবতা প্রেমময় নামে
নিয়ত সদাই রহে গো একা।
শ্রীরাধার সাথে মধুর মিলনে
বাজে গো সেথায় শ্রীধামের সখা।

ওঙ্কারলোকে

বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৪২১ (ইং ২৩শে জুলাই ২০১৪) বুধবার শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন প্রবীণ শিষ্য আসানসোল রবীন্দ্রনগর নিবাসী মোহনলাল সরকার সীতারামলোকে প্রয়ান করেছেন। রাঙ্গাপাড়া আশুতোষ মঠের তিনি একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। আশুতোষ মঠের ও রবীন্দ্রনগর সতীসংঘের বাৎসরিক উৎসবগুলিতে বাজার করাতে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। রাণীগঞ্জে ভূমানন্দদেবের তিনি একজন প্রিয় সেবক ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুরের বিভিন্ন আশ্রমগুলিতে তিনি ভ্রমণ করেছেন। পুরী আশ্রমে মাধব স্বামীজীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিপ্লব সরকার একমাস অশৌচ পালন করে, শাস্ত্রীয় নিয়ামাদি মেনে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যা রেখে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সম্প্রদায়ে দীক্ষিত, তাঁর প্রয়াণে পরিবারের সকলকেই ও সঙ্গীসাথীদের সমবেদনা জানাই।

জয়গুরু

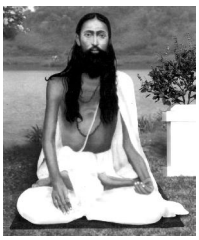

পরমগুরুদেব দাঁশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

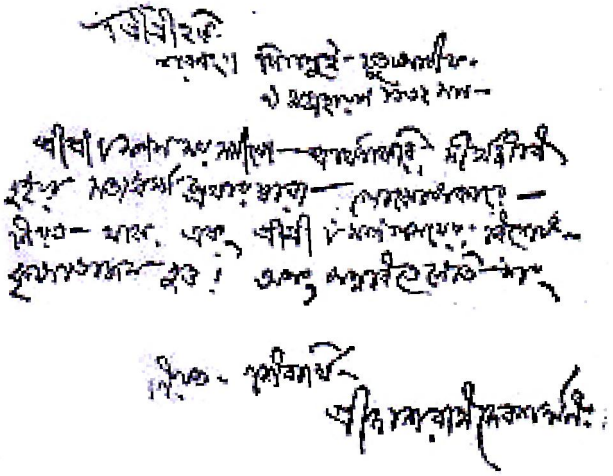

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

শ্রাবণ, ১৪২১ চতুর্থ সংখ্যা

সূচী ঃ

● **সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি** □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯৬ ● **শ্রীগুরুদেবের চরণে সাতদিন** □ কিঙ্কর রামেন্দু দত্ত ২৯৮
● **শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম** □ শ্রীমতী উষারাণী দেবী ৩০১

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

৫ই আশ্বিন, ১৩৬৬—আজ মউ হইতে কর্ণেল গুরুচরণ সিং সপরিবারে এসে দীক্ষা নিলেন। আজ বহুলোকে আজমির গেলেন। আজ বাবা সন্ধ্যায় ''সুধার ধারা'' পাঠ করলেন ঃ—

করহ কীর্ত্তন তুমি করাও কীর্ত্তন।
সুপথ প্রদানে তুষ্ট হন নারায়ণ॥

এরপর পাঠ করলেন ''মিলন গাথা''। বললেন—১৩২৪ সালে ২৩শে পৌষ রাত্রে বদ্ধ পদ্মাসনে বসে জপ করবার পর বদ্ধ পদ্মাসন ছেড়ে আসনে বসে চোখ বুজে হৃদয়ের দিকে ধ্যান রাখি—দেখি না পঞ্চ বদন ডানহাতে ডমরু শিব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কে? তিনি বললেন আমি তোর গুরু। বাল্যে একবার এসেছিলাম চিনতে পারিসনি, আবার এসেছি। প্রপন্ন বললে—আপনি যদি গুরু তা হলে আমায় ইষ্ট দর্শন করান। তিনি তখন পঞ্চমুখে গুরুদেবদত্ত মন্ত্রটি জপ করতে লাগলেন। তাঁর কাঁধ থেকে একটি মাতৃ মূর্ত্তি নেমে আসেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কে? তিনি বললেন আমি তোর মা। একথা বলে হৃদয় প্রপন্নের জ্যোতির্ম্ময় দেহ কোলে নিয়ে কানে ইষ্ট মন্ত্র বলতে থাকেন। গুরু ডমরু বাজিয়ে নেচে নেচে মন্ত্র বলতে থাকেন। ক্রমে মন্ত্রটি চলে গিয়ে রাম রাম হতে থাকে, ক্রমে তা চলে যায়। তারপর ওম্ ওম্ জপ চলে, ক্রমে তাও চলে গিয়ে ভিতরে সাপের মত গর্জ্জন আরম্ভ হয়। এই সময় বাবা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

এরপর ''ব্রজনাথ গাথা'' পাঠ করলেন। পাঠের পর প্রার্থনা মৌন আরতি, নাম মহিমা সংকীর্ত্তন, প্রসাদ গ্রহণ পরে পুনরায় নাম মহিমা সংকীর্ত্তন করে রাত্রি ১২টার পর বিশ্রাম।

৬ই আশ্বিন—আজ স্থানীয় নামকারীদের নামনীড়ে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হল। আজ প্রাতে শ্যামানন্দাদি কয়েকজন বিদায় লইলেন। প্রহরে প্রহরে যথারীতি নাম মহিমা সংকীর্ত্তনাদি করিবার পর আজ অপরাহ্নে বাবা প্রথমে ''সুধার ধারা'' পাঠ করলেন ঃ—

সাধুর উপমা কিছু নাহি এ ধরায়।
স্পর্শমণি তাঁর কাছে লভে পরাজয়॥
লৌহেরে কাঞ্চন করে বটে স্পর্শমণি।
আপন সমান কভু করিতে না শুনি॥
সাধু মহা স্পর্শমণি পরশে যাহারে।
স্বীয় সমতুল্য তিনি করেন তাহারে॥

এরপর পাঠ করলেন ''মিলন গাথা''—অনেক দিনের ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্রজী ত্রিবেণীতে আশ্রম করেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে গরুর গাড়ী করে তাঁর কাছে যান। একদিন তিনি গেছেন আরও দুজন বাঙ্গালী বসে আছেন ব্রহ্মর্ষিজী ঠাকুরকে একখানি চিঠি পড়তে বললেন। ঠাকুর পড়লেন। পত্র লেখক বিখ্যাত তিব্বতী বাবা। তিনি লিখছেন—আপনার সঙ্গে আমার ২০০।২৫০ বৎসর আগেকার আলাপ। আপনার কাছে অনেক জিনিস আছে। আমার শিষ্যটিকে পাঠাচ্ছি, একে কিছু দিবেন (অর্থাৎ শিক্ষিত করবেন)।

পত্র শুনে বাঙ্গালী দুজনে পরস্পর মুখের দিকে চাইতে লাগল। ঠাকুর বললেন—বুঝতে পারছেন না মশাই? দুটিই খোকা। সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

বাবা বলিতে লাগিলেন ঠাকুরকে দীক্ষা দেন তেতেরিয়ার দামোদর দাস মহারাজ। দীক্ষা দিয়ে বলে যান—তুমি শাস্ত্রজ্ঞ তোমায় আর কি বলবো তুমি শাস্ত্রপথে চলিও। ইচ্ছা করলে জ্ঞান মার্গেও যেতে পার। এইজন্য আমরা সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বিশেষ কিছু

পাইনি। পরমগুরুদেব ঠাকুরকে মালা তিলক পর্য্যন্ত দেন নি। ঠাকুর পরে স্বয়ং ধারণ করেন।

তারপর পাঠ করলেন শ্রীশ্রীনাম রসায়ন। শিব বলিতেছেন হে পার্ব্বতী আমি যেমন তুমিও সেই প্রকার। বিষ্ণুও যেমন তুমি উমাও তেমন। উমা যেমন গঙ্গাও তেমন। এই চারিটি রূপের ভেদ নাই। যে ব্যক্তি বিষ্ণু, রুদ্র, শ্রীগৌরী ও গঙ্গা পৃথক বলে সে মূঢ়-বুদ্ধি।

সবশেষে পাঠ করলেন ''ব্রজনাথ গাথা''। জ্ঞানী ব্যক্তি যৌবন বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা না রেখে ভাগবৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করবে। জীবের মানব জন্মে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ তিনিই সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সুহৃদ। ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হওয়া উচিৎ নহে। পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্মবশে বিনা চেষ্টায় দুঃখ প্রাপ্তির ন্যায় মানুষ পশু প্রভৃতি সমস্ত যোনিতেই সকলের বিনা চেষ্টায় ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়ে থাকে। তজ্জন্য বাল্যেই ভাগবদ্ ধর্ম অভ্যাস করে বিষয়াসক্তি দূর করা উচিৎ।

পাঠের পর প্রার্থনা, মৌন, প্রণাম, নাম মহিমা সংকীর্ত্তন, আরতি, ভোগ পুনরায় নাম মহিমা সংকীর্ত্তনের পর রাত্রি ১১টায় প্রসাদ পাওয়া গেল।

নর্মদার অপর পারের ব্রাহ্মণরা আজ নাম নীড়ে সেবা নিলেন। বাবা আজও প্রহরে প্রহরে যথারীতি নাম মহিমা সংকীর্ত্তন করলেন।

৭ই আশ্বিন---আজ সন্ধ্যায় পাঠের সময় ওঙ্কারেশ্বরের রাজা বাহাদুর সপরিষদ এলেন। বাবা তাঁহাকে সসম্মানে বসালেন ও পাঠ্য বিষয় 'পরমাণু' হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলেন। পাঠ শেষ হবার পূর্ব্বে অল্প বাকি আছে এমন সময় মন্দিরের মোহন্ত উঠিয়া পড়িলে বাবা তাঁহাকে নিষেধ করলেন। বললেন ভাগবৎ পাঠ শেষ হবার পূর্ব্বে সে স্থান ত্যাগ করলে বেদ হত্যার পাপ হয়। তখন তাঁরা নিবৃত্ত হলেন। আজ পাঠ করলেন শ্রীশ্রীনাম রসায়ন যথা—

রামানন্দ মুখে শুনি রাম রাম
কবীর লইল নাম।
সার্থক জনম হইল তাহার
পুরিল মনস্কাম॥
গাহিল নানক আর বামদেব
নামের মহিমা গান।
বেশ্যার দাস সে বিল্বমঙ্গল
লভিল নামেতে ত্রাণ॥
গাহিলেন নাম কেন্দু বিল্বগ্রামে
জয়দেব কবিবর
দেহিপদ পল্লবং লিখিলেন যেথা
আপনি মুরলী ধর॥

তারপর ক্ষেপার ঝুলি থেকে পাঠ করলেন 'পরমাণু'; যথা—কার্য্যাংশের যাহা চরম, যার আর অংশ নাই কার্য্যাবস্থা অপ্রাপ্ত, সমুদয় অবস্থা অপ্রাপ্ত অতএব সতত কার্য্য ও সমুদয় অবস্থার অপগম হলেও যাহা থাকে তাহা পরমাণু। যে সমুদিত সকল হইতে ব্যবহার কর্ত্তাগণের অবয়ব বৃদ্ধি হয় তাকে পরমাণু বলে।

দুটি পরমাণুতে একটি অণু।
তিনটি অণুতে এক এসরেণু।।

গবাক্ষ প্রবিষ্ট সূর্য্য কিরণে এসরেণু দেখা যায়। তাহা অতি লঘুত্ব হেতু আকাশেই গমন করে।

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানানন্দ পরমহংসদেব পরমাণু নিয়ে কত খেলা করে গেছেন। তিনি একটা জবা গাছকেই চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিণত করেছিলেন।

পরমহংস বাবা বলতেন সকল বস্তুর মধ্যে সকল বস্তুর পরমাণু আছে যোগ শাস্ত্রেও বলে ''সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং''। কতকগুলি পরমাণু উদ্‌গত ভাবে আছে, আর সকল পরমাণু প্রচ্ছন্নভাবে আছে। উদ্‌গত পরমাণুর রূপেই বস্তুর ব্যক্তরূপ। যোগী ইচ্ছা করলে উদ্‌গত পরমাণু গুলিকে দাবিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ বস্তুর পরমাণুগুলি (যাহা উহাতে প্রচ্ছন্ন আছে) উদ্‌গত করতে পারেন। তখন সেই বস্তু সেইরূপ ধারণ করে।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদেবের চরণে সাতদিন

কিঙ্কর রামেন্দু দত্ত

সেদিন শনিবার বাড়ী ফিরে এসে মাকে জানালুম, ''মা, আমাদের তারিঘাট যাওয়া হল না।'' মনটি যে মুষড়ে পড়েছিল, সে কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। আয়ার মনের ভাব বুঝেও সব কথা শুনে মা বল্লেন—''তা তুই একাই যা' না।''

''দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর কবে কাছে ডেকে নেন।''

সোমবার শ্রদ্ধেয় সচ্চিদানন্দদার চিঠি পেলুম—''এখন তো কলেজ বন্ধ একবার ২।৩ দিনের জন্যেও ঘুরে যাওনা কেন?'' মা বল্লেন—''আর দেরী নয়, এ বাবারই আহ্বান, তুই একাই চলে যা।''

জুন সংখ্যা মাদার পত্রিকার লেখাগুলি জোগাড় করে প্রেসে বুঝিয়ে দিয়ে ২রা জুন বৃহস্পতিবার 'জয়গুরু' বলে যাত্রা করলুম। সেইদিনই দাদা ফিরলেন। দাদা কর্ম্মোপলক্ষ্যে দিল্লী গিয়েছিলেন,ফেরার পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য তারিঘাট ঘুরে এসেছেন। খবর পেলুম, বাবা সুস্থ আছেন, কিন্তু বেড়ার ফাঁক দিয়েও দর্শনের সুযোগ হবে কি না কে জানে! সত্যি কথা বলতে কি, মনটা একটু দমে গেল। —তবে কি দূরদর্শনও হবে না।

শুক্রবার ভোর ৫-৩০টা পর্যন্ত দিলদার নগর স্টেশনে বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল—কখন পৌঁছুব? বেলা প্রায় পৌনে দশটায় আশ্রমে পৌঁছুলাম। একগাল হেসে স্বাগত জানালেন শ্রদ্ধেয় সেবানন্দদা।

প্রথম দর্শনেই আশ্রমটি চমৎকার লাগল। বেশ বড় জায়গা—চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে দুটি বড় বড় আমগাছ ছায়াকুঞ্জ রচনা করেছে। আশ্রমের মধ্যে বিরাট প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের একপাশে নতুন আশ্রমগৃহ ও দালান। তিনখানি মাঝারী ধরনের ঘর। আর তার সামনে টানা দালান। দালানের পরে রোয়াক। রোয়াকের গা দিয়ে ছাতে উঠবার সিঁড়ি। অদূরে আশ্রমের নূতন কূয়াটি। রোয়াকের অপর প্রান্তে রান্নাঘর।

উঠানের দক্ষিণদিকে এই ঘরগুলি। উত্তরদিকে সাত ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা বাবার মৌনকুটীর ও ধ্যানমন্দির। ধ্যানমন্দিরটির চূড়া দেখা যাচ্ছে। বাবার মৌনকুটীরটি প্রকৃতপক্ষে একটি পর্ণকুটীর শুধু মাটি ফেলে খানিকটা উঁচু করা হয়েছে। সে ঘরের দেওয়াল ও ছাদ গমের পাতা দিয়ে তৈরী। অবশ্য কয়েকটি ইটের থাম আছে। বাবার কুটীরের সামনে একটু মাটির দাওয়া। তারপরে তিনটি ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির সামনে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত তুলসীমঞ্চটি। ধ্যানমন্দিরটি একেবারে বেড়ার কোনঘেঁষে। ধ্যানমন্দিরের সামনে বিরাট তুলসীকানন—আর তার মধ্যেই বসবার জন্যে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা।

সচ্চিদানন্দদা, সেবানন্দদা, ধ্যানানন্দদার কুটীরটি কিন্তু আশ্রমের পাঁচিলের বাইরে। সেটি একটি বড় আম বাগান।

অদূরে মা গঙ্গা অপূর্ব্ব শোভা নিয়ে বিরাজ করছেন। আশ্রম থেকে সব সময়ই মায়ের রূপ চোখে পড়ছে। গঙ্গার অপর তীরে গাজীপুর শহর। গাজীপুর প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গাজীপুর মহারাণা বিশ্বামিত্রের রাজধানী ছিল। একালে বিখ্যাত সাধক পওহারী বাবার স্মৃতির সঙ্গে শহরটিকে মনে পড়ে। যেমন কাশীতে গঙ্গার একতীরে বারানসীধাম, অন্যতীরে শস্যক্ষেত্র। এখানেও তেমনি একতীরে গাজীপুর শহর, আর অন্য তীরে এই তারিঘাটের শস্যক্ষেত্র। আমাদের আশ্রম থেকে গঙ্গার মধ্যে কোন বাড়ীঘর নেই। শুধু একটি বাস চলবার পথ আছে মাত্র। আশ্রমের পরিবেশটি বড় মধুর। সামনে ফাঁকা মাঠ ও গঙ্গা। আর অন্য তিনদিকে বিরাট আমবাগান। উত্তরদিকের আমবাগানের পরেই তারিঘাট রেলস্টেশন।

আশ্রমে পৌঁছুতেই মন ভরে গেল। বেড়ার এদিক থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করলুম। বাবার মৌনকালে এই নিয়ম বরাবর চলে। বহির্জগত থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্যে এমনি উঁচু বেড়া দিয়ে দেবার আদেশ দেন।

এখানে মহাপ্রয়াণ মঠেও সেই ব্যবস্থাই। তবে আর একটু বেশী। বেড়ার ওধারটিতে চট দিয়ে পর্দা মত করে দেওয়া হয়েছে। আর উঠানের দিকে বেড়ার গায়ে দাদারা বাঙলা ও হিন্দীতে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছেন ''বেড়ার ফাঁক দিয়েও বাবাকে দেখবার চেষ্টা করবেন না, বাবার নিষেধ।'' বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে বেড়ার কাছে গিয়েও দেখবার চেষ্টা করব, কি করব না ভাবছি, এমন সময় সেবাদা বল্লেন—''বাবা ধ্যানমন্দির থেকে বেরুচ্ছেন, দর্শন করবেন?'' দাদার ইঙ্গিতে অতিকষ্টে বেড়ার ফাঁক থেকে চকিতের মত দূরদর্শন হল। মনে মনে ভাবলুম—''ঠাকুর মগরা বা ওঙ্কারেশ্বরে কোথাও তো তোমাকে এমন চুরি করে দর্শন করতে হয়নি— এবারও কি হবে না।

শ্রদ্ধেয় সচ্চিদানন্দদা স্নান সেরে ফিরলেন। দাদা, আলিঙ্গনাদি করবার পর থাকবার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। আগেরদিন উমেশদা (ডাঃ উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী) এসেছেন। তিনি শ্রদ্ধেয় প্রণবানন্দজীর ঘরেই উঠেছেন। আমারও সেই ঘরেই স্থান হল।

সেদিন রাত্রে আর একবার দর্শন হল—প্রায় অতর্কিতেই বলতে হয়। রাত্রে প্রচণ্ড গরমের জন্য বেড়ার পাশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনেই সকলে শোবার ব্যবস্থা করছেন। এদেশে এটাই রীতি। একটি দাদার সঙ্গে তাঁর কম্বলের উপর বসেছিলুম। এমন সময় বেড়ার ওপারে হঠাৎ আলোর রেখা দেখা গেল। সবাই ছুটে বেড়ার ধারে গেলেন। বাবা যেন আমাদের দর্শন দেবার জন্যই তুলসীমঞ্চের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে মৌনকুটীরে প্রবেশ করলেন।

পরেরদিন (শনিবার) বাঙলা ও কানপুর থেকে অনেকে এলেন—তাঁদের মধ্যে দিগসুই থেকে শ্রদ্ধেয়া কুটাইদিদি ও পিসীমা, বর্ধমান থেকে বৌদি (ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী), গঙ্গাদা, রমেশদা, সনৎদা ইত্যাদি রয়েছেন। কানপুর থেকে 'পরমানন্দে'র সম্পাদক অধ্যাপক সুশীলদা সপরিবারে এসেছেন। কানপুরের আরো অনেক দাদা এসেছেন।

কুটাইদিদি ও পিসীমা বাবার কাছে মৌন কুটীরে গেলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করবার পর ধ্যানানন্দদা এসে জানালেন—আর যত মায়েরা এসেছেন, তাঁরা দূর প্রণাম করবার অনুমতি পেয়েছেন। মায়েদের পরেই আমরাও অনুমতি পেলাম।

সেদিন সকালে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাবার কাছে থাকবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সে এক আনন্দঘন দিন। বাবা মৌন-কুটীরের বাইরে বসে আছেন। আর কাগজে লিখে লিখে লোকজনের খবর নিচ্ছেন। বাবা আগের থেকেও কৃশ হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি সুস্থ। তাঁর সেই সদাপ্রফুল্লমূর্ত্তি যেন আগের চেয়ে আরো সুন্দর লাগছিল। কুটাইদিদির প্রশ্নের উত্তরে বাবা লিখে জানালেন— ''সীতারামের এখনও কাজ আছে— দেহ যাবে না।'' সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নরনারী জয়ধ্বনিতে দিকদিগন্ত মুখরিত করে তুললেন। সেখানে যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে যেতে লাগল। এরই মধ্যে পরমারাধ্য মহামহোপাধ্যায়ের তিরোধানের খবর শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাতে তিনি কিছুক্ষণ ধ্যাননিমীলিত নয়নে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। রোদের তাত বাড়ছে—আমরা সবাই স্পর্শ প্রণাম না করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তখনকার মত বিদায় নিলুম।

দুপুরে প্রসাদ পাবার পর বাবার শ্রীচরণে আবার সবাই সমবেত হলুম। দেখি সেই মগরার আনন্দকাননের পরিবেশ। বাবা যদিও মৌন, কিন্তু কাগজে লিখে লিখে গল্প বলছেন, আর প্রত্যেকটি আশ্রমের, নানা ব্যক্তির খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন—এ তাঁর কৃপা। বই-এর গাদা থেকে একখানি মাদার পত্রিকা তুলে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর? বাবার শ্রীচরণে পত্রিকার সংবাদাদি জানালুম।

উমেশদাকে দেখে বাবা লিখলেন—''মৌনে তোর কথা মনে হয়েছিল'' দক্ষিণ শ্রীচরণটি দেখিয়ে লিখলেন —''পায়ের খিলটা খুলে দিতে পারবি। পঞ্চানন, শৈলেন,

তুই এই তিনজনে পরামর্শ করে এক্স-রে করে দেখে তারপর উমেশদা শ্রীচরণটি পরীক্ষা করবার অনুমতি প্রার্থনা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বদ্ধ পদ্মাসনের স্থিতি ইঙ্গিতে দেখিয়ে জানালেন, তিনি এইভাবে বসতে চান। লিখে জানালেন— ''৩০ বছর ধরে ঠাকুর এভাবে রেখেছেন, কখনও ইহা হয়নি। তোদের কথা স্মরণ হতে মনে একথা ভাসছে।'' উমেশদা স্পর্শ না করে উপর থেকে পরীক্ষা করে বল্লেন—''কেন বাবা, আর একটু বোধহয় মোড়া যায়।'' ঠাকুর ইঙ্গিতে কাছে এগিয়ে এসে পরীক্ষা করবার অনুমতি দিলেন। ডাক্তার দাদা বাবার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বল্লেন— ''ফি-টা আগেই নিয়ে এলুম।'' মৌনের মধ্যে কেউই বাবাকে স্পর্শ করতে পারেন না—উমেশদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপালাভ করে ধন্য হলেন।

সেদিন রাত্রেও বাবা ধ্যানস্তম্ভের সামনের চত্বরে বসে আমাদের কিছুক্ষণ সঙ্গদান করলেন। সেদিন রাত্রে বাবার বেড়ার পাশে ঘুমাবার সুযোগ পাওয়া গেল।

রবিবার সকালে একটি বিরাট দল এসে পৌঁছুলেন, তাঁদের মধ্যে এলেন রাণীগঞ্জের অনেক দাদা, আর আমাদের সদানন্দদা। সারাদিন আশ্রমে যে লোক সমাগম চলতে লাগল, তা মগরার চাতুর্মাস্যের সঙ্গে তুলনা করা না গেলেও নেহাৎ কম নয়। এদিকে আশ্রমের বিরাট প্রশস্ত উঠানে সামিয়ানা টাঙিয়ে শনিবার থেকে অখণ্ড নাম চলছে। নতুন আশ্রম গৃহের দরদালানে চলছে অখণ্ড জপ। শুধু এখানে নয়, জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই এই কদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের দীর্ঘ জীবন কামনায় অখণ্ড নাম ও জপ চলেছে।

এর মধ্যে আশেপাশের গ্রামেও গাজীপুর শহরে রটে গেছে—''বাবা দর্শন দেতে হৈ''। দেখতে দেখতে আশ্রমের সমস্ত উঠানটি ও আশেপাশের আমবাগান অজস্র লোকে ভরে গেল। একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। এখানকার স্থানীয় লোকেদের যখন জানান হল যে বাবাকে স্পর্শ প্রণাম করবেন না, তখন ঐ বিরাট জনতা শুধু দূর প্রণাম করে ধীরে ধীরে প্রসাদ নিয়ে চলে যেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে একসঙ্গে দর্শন দেবার চমৎকার সুযোগ করে দিলেন। নতুন আশ্রম বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়ে বসলেন তিনি আর আশ্রমের মধ্যে ও বাইরে অগণিত নরনারী তাঁর দর্শন পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেল। এইভাবে নাম-যজ্ঞ ও আনন্দহিল্লোল সারাদিন চলতে লাগল।

এখানে প্রচণ্ড গরম। রাত্রে প্রায় সাড়ে নয়টা-দশটা পর্যন্ত গরম হাওয়া চলে। শুক্রবার, শনিবার এইভাবে কেটেছে। কিন্তু রবিবার ঠাকুরটি তাঁর সাধ্যমত প্রকাশ দেখালেন। রবিবার ভোর থেকে এমন পাতলা মেঘ হল যে সারাদিন রোদের তাত তো হলই না। বরং গঙ্গার দিক থেকে বসন্তকালের মত একটা ফুরফুরে বাতাস সারাদিন বয়ে চলল।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বসলেন ধ্যানস্তম্ভের সামনে। তাঁর আশেপাশে ভক্ত শিষ্যরা ভিড় করে সঙ্গলাভ করছেন। কথা উঠল 'প্রণব পারিজাত' ও 'জয় জগন্নাথ' পত্রিকার প্রসঙ্গ নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন যে আমাদের পরমারাধ্য পরমগুরুদেবের নির্দিষ্ট পথেই তাঁর সমস্ত পত্রিকাগুলি চলবে—''সীতারাম কারুর আইন মেনে চলবে না, সীতারাম তার ঠাকুরের আইনই মেনে চলবে।'' এই প্রসঙ্গে সদানন্দদা ও সুশীলদাকে ঠাকুর যথাক্রমে 'মাদার' ও 'পরমানন্দ' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় সাধারণভাবে তাঁর পত্রিকাগুলির নীতি কি হবে, সেগুলি কোন পথে চলবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশও ঠাকুর দিয়ে দিলেন একটি স্বতন্ত্র পত্রে। এতে পত্রিকার সম্পাদক ও সংসেবকদের বিশেষ সুবিধা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন যে তাঁর ছেলেমেয়েরা যারা এখনও 'প্রণব পারিজাতের গ্রাহক হয়নি তারা যেন সকলে গ্রাহক হয়ে যায়। এমনকি যাঁরা সংস্কৃত পড়তে জানেন না, তাঁরাও যেন পত্রিকার গ্রাহক হন ও নিত্যপূজা কালে ওঁকে প্রণাম করেন—প্রণব তাঁদের কৃপা করবেন। রবিবার রাত্রে শ্রীরামায়ণ গান করে শোনালেন বর্ধমান জেলার বেলরুই গ্রামের শ্রীঅভয়াপদ রায়। নামমঞ্চে বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গান শুনতে বসলেন। রাত সড়ে দশটা পর্যন্ত শ্রীরামায়ণ গান শুনে বাবা বিশ্রাম করতে গেলেন।

ক্রমশঃ

বোলপুর ও শান্তিনিকেতন

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস

শ্রী ম তী উ ষা রা ণী দে বী

কিছুদিন থেকেই শুনছি আমাদের প্রাণের প্রিয় ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বোলপুরে আসবেন। একবার 'ত শুনলাম এই অগ্রহায়ণেই বাবা আসছেন বোলপুরে; তিনদিন থাকবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায় সেবার বাবার আসা হল না। এবার আমার শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম দয়া—তাই সবাই দেখা পেলাম বাবার।

সেদিন বুধবার ১৩ই মাঘ ১৩৬৬। খবর পেলাম খুব ভোরে রাত থাকতেই গয়া প্যাসেঞ্জারে বাবা শ্রীশ্রীসীতারামদাস গুরুভাইদের নিয়ে বর্ধমান থেকে বোলপুরে পৌঁছবেন। সেখানে ত্রিশূলা পটিতে গুরুভাই শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়দিগের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের বাড়ীতে ও বাড়ীর প্রাঙ্গনে বাবার নাম কুঞ্জ। রাত থাকতেই তোড় জোড়। ব্যস্ততার অন্ত নেই। কখন দর্শন পাব। ভোরেই স্নান করে শুচিবস্ত্র পরে, আমরা ছুটলাম বোলপুরে ত্রিশূলা পটিতে—বাবার অস্থায়ী নামকুঞ্জে। গিয়ে দেখি, ভোর থেকেই নামকীর্ত্তন শুরু হয়েছে। নানাদিকে কর্মব্যস্ততা। ত্রিশূলা পটির বড় রাস্তার পাশে ত্রিপল খাটিয়ে বাবার ভাষণ দেবার ও প্রণাম নেবার আসর তৈরী হয়েছে। তার প্রবেশ দ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ। চারিদিকে পরম-পবিত্র তুলসী গাছের আবেষ্টনের মাঝখানে শ্রীশ্রীনারায়ণের পট দিয়ে একস্থানে পরমদেবতার আসন স্থাপনা করা হয়েছে। সারা প্রাঙ্গন জুড়ে মধুমাখা নামের প্লাবন বইছে। চারিদিকে কত লোকের চলাফেরা।

ত্রিশূল পটিতে পৌঁছেই খবর পেলাম শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরে পৌঁছতে পারেন নি। দুপুরে বারৌনি প্যাসেঞ্জার-এ আসছেন। বেলা ১০।৩০টা নাগাদ আমাদের প্রিয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে আনবার জন্য আমরা সবাই খোল করতাল সহ নামকীর্ত্তন করতে করতে রেলস্টেশনে উপস্থিত। ট্রেন পৌঁছিবার যেন কিছু বিলম্ব আছে। সমানে নামকীর্ত্তন চলেছে। দেখতে দেখতে রেলপ্রাঙ্গন বাবার দর্শনার্থীতে ভরে গেল। বাবা আসছেন—চারিদিকে আনন্দের ঢেউ উঠেছে। নানা দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অনটনে পীড়িত বাঙলার বুকে, বাঙালীর ঘরে ঘরে না আজি আজ কোন্ পরম পুরুষের অপার্থিব করুণায় নাম গানের বাণ ডেকেছে। ভগবানের নাম চলেছে। এত ভাল লাগছিল—সে কি আগ্রহ। ব্যাকুল হয়ে সবাই অপেক্ষা করছি, কখন বাবাকে নিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াবে। আমরা বাবার দর্শন পাব, স্পর্শন পাব। শত সহস্র প্রণামে লুটিয়ে দেবো একান্তভাবে নিজেকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল স্টেশনে। দেখলুম বাবা নেমে আসছেন প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনের দরজার ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কে একটু চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করবে—কে একটু আগে তাঁর দর্শন পাবে। আকুলতার অন্ত নেই। ট্রেন থেকে নেমে গলায় মালা দোলাতে দোলাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ত্বরিত পদে এগিয়ে চল্লেন—বাইরে, যেখানে অনেক গুরুভাইরা অপেক্ষা করছেন মোটর নিয়ে। বাবাকে মোটরে চড়িয়ে নামকীর্ত্তন করতে করতে জনতার মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল— ত্রিশূলপটির দিকে। পৌঁছেই গাড়ী থেকে নেমে ত্রিপল ঢাকা প্রাঙ্গনের নাম মঞ্চে উঠে সকলের প্রণাম নিলেন। বেলা বেড়ে চললো—দ্বিপ্রহরের পরই বহুলোককে দীক্ষা দিলেন; আমরাও দীক্ষায় বসলাম। দীক্ষা শেষে প্রণাম নিতে ও প্রসাদ পেতে বেলা গড়িয়ে গেল।

দীক্ষান্তে প্রণাম সেরে বাইরে শুনি বাবা এখুনি শান্তিনিকেতনের পথ দিয়ে গোয়ালপাড়া যাবেন—গুরুভাই শক্তিপদ বাবুর বাড়ীতে। দু-তিনখানা মোটরে চড়ে। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতীক্ষায় পথের উপর অপেক্ষা করছেন আমাদের বীণাদি, সুশীলবাবু, অশোকবাবু ও আরও অনেকে। ভাবছি বাবা যাচ্ছেন 'ত ঐ পথ দিয়েই—আমাদের কি একটু কৃপা করবেন না! তাই ত এতই কি সৌভাগ্য হবে আমাদের—এমন সময় দেখি গাড়ীর পাশে ভিড় জমেছে। বাবা উঠে বসেছেন গাড়ীতে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গাড়ী রওয়ানা হল। ভাবছি কি করি, কি উপায়ে শান্তিনিকেতনের বাসায় খবর দেবো, আমরা 'ত বাবার গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ে পারব না পৌঁছতে। আমাদের অনেক আগেই তিনি পৌঁছবেন—শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকে গোয়ালপাড়া। সবই আমাদের পরম দয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া; তাঁর ইচ্ছা হলে কি-না হয়।

আমাদের পাশেই দেখি একটা সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে সে বলছে ''উঠে পড়ুন দিদি, ঠাকুর যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে''। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘুরিয়ে চালক চললো শান্তিনিকেতনে। পথে আসতে শুনি বাবা পথের পাশেই গুরুভাই অশোকবাবুর বাড়ীতে। সেই অবসরে আমরা এগিয়ে এলুম একটু; কিন্তু হলে কি হবে বাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি আমরা পারি। দেখি তাঁর গাড়ী পেছনে—গাড়ী ক'খানা আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল—আর নাগাল পেলাম না। কি হবে, কেমন করে বাবাকে নিয়ে যাব একবার আমাদের ভাঙা ঘরে। মনে মনে বড় আকাঙ্ক্ষা খোকাকে একবার বাবার চরণে প্রণাম করাই, সে ত এই অবস্থায় এ ভাবে দৌড়াদৌড়ি করে এত ভিড়ে বাবার চরণ দর্শন করতেই পারবে না। প্রণাম 'ত দূরের কথা।

পথে রিক্সাচালকই বললে দিদি, বাবা যাচ্ছেন মুকুল রায়ের বাড়ী সেখান থেকে সুশীলবাবুর বাড়ী হয়ে গোয়ালপাড়া যাবেন। মন মানে না। আকুলি বিকুলি করছে প্রাণের মধ্যে—ঠাকুর মনের ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে না? তাহলে আর খোকার প্রণাম করা হয় না। তবে যদি তিনি—আমার ঠাকুর—দয়া করেন; যদি তাঁর করুণা হয়। জোরে রিক্স চললো। বাসায় পৌঁছেই দেখি আমার ছোটবোন 'ছবি' একা একা খোকাকে ও ননিকে নিয়ে ঘর দুয়ার ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে বাবার জন্য আসন সাজিয়েছে। ধূপ, ধুনো ফুলের মালা সব তৈরী। তার ও খোকার একান্ত ইচ্ছা বাবা একটি বার একটু ক্ষণের জন্যও যদি চরণের ধুলো দেন, তবে তারা তাঁকে প্রাণ ভরে প্রণাম করতে পারে।

আমরা পৌঁছতেই খোকা বললে মা, আমরা খবর পেয়েছি রামানন্দবাবুর কাছ থেকে আমাদের ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আসছেন তাই আমরা বোলপুরে যাবার উদ্যোগ্ করি নি। মাসীমণি গিয়েছে সুবর্ণ মাসীমার বাড়ী ঠাকুরকে আনতে আমাদের বাসায়। তুমি ভেবোনা, ঠাকুর আসবেনই। তোমরা ফিরতে এত দেরী করলে?

আমি বলি সে কিরে, কোথায় আসবেন, কে তাঁকে আনবে। কোনও বলা নেই কওয়া নেই আমাদের কোনও উদ্যোগ আয়োজন নেই—বল্লেই কি ঠাকুর আসবেন! এতদূরে। কি করবো আমিও ছটফট করছি। হাতের কাছে নিত্য পূজার যে ফল, মূল, বাতাসা আনিয়ে গুছিয়ে রেকাবীতে সাজালাম।

ক্রমশঃ